পর্যটন বিচিত্রা

ডিসেম্বর ২০২২

পড়তে পড়তে গন্তব্যে...

www.parjatanbichitra.com

REDISCOVER HARMONY

Room Heaven Package
BDT 11,000 Net.

Package Benefits:
- Stay at Deluxe Room
- Buffet Breakfast for 2 persons
- Use of Swimming Pool & Health Club
- 50% Discount on Laundry Services

*Valid till December 31, 2022

For reservations visit - www.intercontinental.com/dhaka
or
call +880 2 55663030

CHICAGO
WASHINGTON
NEW YORK
BORDEAUX
LONDON
DHAKA
PARIS
MARSEILLE
DAVOS
DUBAI
KOH SAMUI
SINGAPORE

Live the InterContinental life

INTERCONTINENTAL
DHAKA

পর্যটন বিচিত্রা

পড়তে পড়তে গন্তব্যে...

www.parjatanbichitra.com

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

ধীরে চলুন!

কয়েক দিন ধরে একটি বিষয়ে গভীরভাবে ভাবছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি যুব সমাজের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, প্রচারণাই যেন ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি গন্তব্যের আকর্ষণীয় বিষয়ে গভীরভাবে জানা-বোঝা ও উপভোগ করার চেয়ে ছবি তোলা, ভিডিও করা, লাইভে প্রচারই যেন ভ্রমণের মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অথচ ভাবুন! যখন মোবাইলের দৌরাত্ম্য ছিল না, মোবাইলে ক্যামেরা ছিল না, ক্যামেরার দুষ্প্রাপ্যতা ছিল, তখন অনেক পরিব্রাজক দেশ-বিদেশ ও বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণ শেষে তারা লিখেছেন। যদিও তখন প্রকাশকের অনেক অভাব ছিল, প্রকাশনার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। তারপরও শত শত বছর পর তাদের লেখনির কারণেই সেসব পরিব্রাজক অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা আবার অনেককে বিশ্ব পাঠশালা ভ্রমণে আজও উদ্বুদ্ধ করে চলছে। তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পড়ে সেই সময়ের সমাজব্যবস্থা, যোগাযোগ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা আজও জানতে পারি। যারা গভীরভাবে একটি গন্তব্যের নির্যাসটুকু উপলব্ধি, অনুভব ও উপভোগ করেছেন ও লিপিবদ্ধ করে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম- হিউয়েন সাঙ, ইবনে বতুতা, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা, ফারদিনান্দ মাজেলান, নিকোলাস পিজেন্টো, লুইস ভারটোমেনাস, কাইজার ফ্রেডরিক, চার্লস ডারউইন, সেবাস্তিন ম্যানরিখ, টমাস স্টিভেন্স, রামনাথ বিশ্বাস প্রমুখ।

একবার ভাবুন! ভ্রমণে গভীরভাবে গন্তব্যের আকর্ষণ-অনুষঙ্গ, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস উপভোগ করবেন, নাকি সোশ্যাল মিডিয়ায় হালকা বাহবা পাওয়ার জন্য ছবি ও ভিডিও করে ব্যস্ত সময় পার করবেন? অল্প সময়ে অনেক গন্তব্যে ছুটোছুটি না করে, বেশি সময় নিয়ে ভ্রমণকে উপভোগ্য করুন। বর্তমান সময়ে পর্যটকদের 'ধীরে চলার' একটি চল চালু হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে 'ধীরে চলার' চল (Slow travel) বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দ্রুত সময়ে প্লেনে গন্তব্যে পৌছার চেয়ে, সময় নিয়ে ট্রেন, বাস বা লঞ্চে চড়ে পারিপার্শ্বিকতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। গন্তব্যের আকর্ষণ, স্থানীয় সংস্কৃতি ও খাবার আনন্দের সাথে উপভোগ করুন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যপূর্ণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। আর ভ্রমণ শেষে লিখুন- ইহাই স্থায়ী। যেমনটি শতবর্ষ পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় লিখেছেন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে'।

টি-ট্যুরিজম

অপরূপ সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। অঞ্চলভেদে পর্যটন বিচিত্রার এবারের প্রকাশনায় গুরুত্ব পেয়েছে সিলেট ভ্রমণের খোঁজখবর। বৈচিত্র্যময় সিলেটের চা বাগানের দিগন্ত বিস্তৃত নৈসর্গিক সৌন্দর্য, প্রকৃতি, জীব-বৈচিত্র্য, পাহাড়, ঝরনা, বিস্তীর্ণ হাওড় অঞ্চলকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। এই অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কিছুটা ভিন্নতা যেমন রয়েছে; তেমনি আদিবাসীদের মধ্যে মণিপুরি, খাসিয়া, গারোদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে দৃশ্যমান ভিন্নতা। ভ্রমণ গন্তব্যের বিবেচনায় সিলেট অঞ্চলের আকর্ষণ অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন, বৃহত্তম এবং সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মালনিছড়া চা বাগান সিলেট জেলায় অবস্থিত। ১৮৪৯ সালে লর্ড হার্ডসন ১৫০০ একর জায়গার ওপর এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৬'র অধিক চা বাগান রয়েছে বাংলাদেশে। চা বাগানের প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি শিক্ষণীয় ও অভিজ্ঞতামূলক ভ্রমণ অনুষঙ্গ। চা বাগানের অতীত ইতিহাস ও আকর্ষণীয় সব বাংলো বাড়ির আতিথেয়তায় এখনো অতি প্রাচীন রীতি রেওয়াজ বিদ্যমান। এ সব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যথাযথ গুরুত্বের বিবেচনায় এনে দায়িত্বশীল পর্যটন (রেসপন্সিবল ট্যুরিজম) শিল্প বিকশিত করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে চা-শিল্পের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েই পরিকল্পনা করতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে পর্যটন

পর্যটন শিল্পে প্রায় একযুগ ধরে হোম-স্টে নানাভাবে গুরুত্ব বহন করছে। বাংলাদেশও এই পথে হাঁটতে শুরু করেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। প্রশাসনিক স্বীকৃতি ও নীতিমালার অভাবে অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রাম-গঞ্জে বা পর্যটন গন্তব্যে প্রবর্তন হচ্ছে কমিউনিটি বেজড হোম-স্টে। একই সাথে শহরেও প্রবর্তন হচ্ছে পরিবার কেন্দ্রিক হোম-স্টে ব্যবস্থা। হোম-স্টের মূল ধারণাটাই হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে একটি পরিবারের সাথে অবস্থান করে তাদের সংস্কৃতি ও খাবার-দাবার উপভোগ করা।

সিলেটের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামে মণিপুরি আদিবাসীদের নিয়ে ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম। যেখানে অর্থের বিনিময়ে স্থানীয়দের বাড়িতে থাকা ও খাবারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আতিথেয়তা ও সংস্কৃতি উপভোগ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে পর্যটক সেবা প্রদানের কৌশল উন্নয়নে 'আজিয়ার ট্যুরিজম' নিরলসভাবে কাজ করেছে এই জনগোষ্ঠীর সাথে। সহায়তা করেছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। ইতোমধ্যেই এখানে দেশ ও বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনায় স্থানীয় গ্রামবাসী আগের চেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। এক সময় গ্রাম-অঞ্চলে পর্যটক বা বিদেশিদের উপস্থিতিতে স্থানীয়রা স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না, এখন সাগ্রহে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এই জনগোষ্ঠী। প্রাথমিকভাবে ১০টি পরিবারে এই সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেও এখন গ্রামের প্রায় ৭৫টি পরিবার পর্যটকদের সেবা প্রদান করে থাকে। পর্যটন শুধুমাত্র বিনোদন নয়, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম একটি মাধ্যম। তারই একটি দৃষ্টান্ত ভানুবিল মাঝেরগাঁও কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম।

'বানিয়াচং আমার দ্যুইন-নাই'

বাংলাদেশের নৈসর্গিক ও ভৌগলিক পর্যটনের বিবেচনায় সিলেট অঞ্চল একটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য। বাংলাদেশের ভূ-প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গড়ে উঠলেও সিলেটের হবিগঞ্জের বানিয়াচং গ্রামটি ব্যতিক্রম। কয়েকটি ইউনিয়নে বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্রাম- বানিয়াচং। উইকিপিডিয়া লিখেছে- এটি এশিয়ারও বৃহত্তম গ্রাম। এই গ্রামেই ১৮৯৪ সালের ১৩ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণকারী ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস।

ভূবন বিখ্যাত এই ভূ-পর্যটক বাইসাইকেলে বিশ্বের চারটি মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন। তখনো অবিভক্ত ভারতবর্ষ। শেষ জীবনে রামনাথ ছিলেন কলকাতায়। লিখেছেন ভ্রমণবিষয়ক ৩০টি বই, গল্প ও উপন্যাস। তার নামে কলকাতায় একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে 'রামনাথ বিশ্বাস লেন'। বাংলাদেশের যুবসমাজ বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের সাইকেল ভ্রমণের অনুপ্রেরণায় বসিয়েছেন রামনাথ বিশ্বাসকে। তার প্রকাশিত ভ্রমণবিষয়ক বইগুলো পর্যায়ক্রমে পুনঃপ্রকাশ করা হচ্ছে পাঠকের চাহিদায়। আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে রামনাথ বিশ্বাসের দর্শন, সাইকেল চালিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। ইতোমধ্যেই গঠিত হয়েছে রামনাথ বিশ্বাসের বসতভিটা পুনরুদ্ধার কমিটি।

সম্প্রতি রামনাথ বিশ্বাস নিয়ে একটি সেমিনার হয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। সেখানে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে- ১৩ জানুয়ারি তার জন্মদিনে রামনাথ দিবস উদযাপন, বসতভিটায় রামনাথ বিশ্বাস পাঠাগার স্থাপন এবং বানিয়াচংয়ে রামনাথ বিশ্বাসের বসতভিটা বাইসাইকেল পর্যটকদের জন্য অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা। যেমনটি রামনাথ বিশ্বভ্রমণ শেষে বানিয়াচংয়ে তাকে দেয়া এক সংবর্ধনায় বলেছিলেন 'বানিয়াচং আমার দ্যুইন-নাই' (বানিয়াচং আমার দুনিয়া)। ঠিক তেমনিভাবে রামনাথের বসতবাড়িকে তীর্থস্থান গড়ে তুলতে চান বাইসাইকেল পর্যটকরা। সফল হোক এই জাগরণ, দখলদারমুক্ত হোক রামনাথের বসতভিটা।

১০ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৩

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প। এই শিল্পের বহুমাত্রিকতার সুফল ছড়িয়ে টেকসই উন্নয়নে পর্যটন মেলা একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। পর্যটন বিচিত্রা আয়োজনে ২০০৭ সাল থেকে পর্যটন মেলা এই শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত- চার বছর নিয়মিত 'ঢাকা ট্যুরিজম ফেয়ার' নামে এই মেলা অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে ২০১১ সাল থেকে 'এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার' নামে নিয়মিত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আঞ্চলিক এই পর্যটন মেলা। পর্যটন শিল্প উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার' আঞ্চলিক পর্যটনের টেকসই উন্নয়নে নিরব সেতু রচনা করে চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৯টি দেশের ১৩০টি পর্যটন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এক অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্য দিয়ে গেল সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২২।

আসন্ন '১০ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২৩' আরও বর্ধিত কলেবরে ১৫টি দেশের অংশগ্রহণে অন্তত ২৫০টি পর্যটন প্রতিষ্ঠান নিয়ে ঢাকায় ২১-২৩ সেপ্টেম্বর আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন বিচিত্রা। এই মেলা পরিদর্শনে সবার প্রতি রইল অগ্রিম আমন্ত্রণ।

প্রকাশক ও সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন হেলাল কর্তৃক সম্পাদকীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং টেকমি প্রিন্টার্স প্রেস ২৬৭/জি, কমিশনার গলি, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

কপিরাইট © পর্যটন বিচিত্রা
পর্যটন বিচিত্রা-এ প্রকাশিত কোনো লেখা ও তার কোনো অংশ প্রকাশক ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

সম্পাদকীয়

সম্পাদক
মহিউদ্দিন হেলাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ঝর্ণা মহিউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মীর শামছুল আলম বাবু

গবেষণা
ড. মো. আতাউর রহমান
জিয়াউল হক হাওলাদার
সাহিদ হোসেন শামীম
ইমরান উজ-জামান

ফিচার
হোমায়েদ ইসহাক মুন
মারজিয়া লিপি

ফেয়ার ও বাণিজ্য সম্পাদক
বোরহান উদ্দিন

হেড অব
মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন
সালাউদ্দিন অটন

বাণিজ্যিক নির্বাহী
মেহেদী হাসান
সোহেল মিয়া

সার্কুলেশন
আতিকুল মোল্লা

শিল্প নির্দেশক
নাজির খান খোকন

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. খোকন মিয়া
মো. আবু বক্কর সিদ্দিক

বিদেশ সংযোগ
আশরাফুজ্জামান উজ্জল
জুন মুখার্জী
শিমুল রহমান

সম্পাদকীয় কার্যালয়

বাণিজ্যিক কার্যালয়
বাড়ি ৯৭/১, ২য় তলা (২-বি)
শুক্রাবাদ, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮০২-২২২২৪২৯৪৪
ইমেইল : parjatanbichitra@gmail.com
info@parjatanbichitra.com
ওয়েব : www.parjatanbichitra.com

নিবন্ধিত কার্যালয়
এমআর সেন্টার (৭ম তলা) বাড়ী-৪৯
রোড-১৭ বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩
বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পর্যটন বিচিত্রা
ডিসেম্বর ২০২২

জলাবন রাতারগুল ▶ ১২

ক্যান্ডির কোলে ▶ ৪৮

প্রচ্ছদ: চা বাগান
আলোকচিত্র: মুস্তাফিজ মামুন

'স্বর্গের জাহাজ ভাসান' উৎসব ▶ ৪১

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়—

- সিলেট শহরের দর্শনীয় যতো স্থান ০৫
- তামাবিল ০৮
- জাফলং ০৯
- নীল পানির লালাখাল ১০
- বিছানাকান্দি ১১
- মনভোলানো সাদা পাথর ১৪
- মৌলভীবাজার ১৭
- হাকালুকি হাওড় ২০
- শ্রীমঙ্গল ২২
- ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রাম ২৭
- সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবার ৩০
- আমিই রামনাথ ৩৪
- দ্বিচক্রযানে রেমা-কালেঙ্গা ৩৫
- অতিথি পাখি আর লাল শাপলার বাইক্কা বিল ৩৬
- হরিপ্রভা তাকেদা ৩৯
- জলপথে চিলমারী ৪৫
- বাংলায় রেঁনেসা ঐতিহ্য ৪৭
- ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার (এটিএফ) ৫২
- ৯ম এটিএফ ফটো অ্যালবাম ৫৩

সিলেট শহরের দর্শনীয় যতো স্থান

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও সিলেটের রয়েছে প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসীদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি। হযরত শাহজালাল আর শাহ-পরাণের স্মৃতিধন্য সুরমা তীরের শহর সিলেট। ছোট্ট এই শহরে আছে দর্শনীয় অনেক জায়গা।

হযরত শাহজালালের (র.) মাজার

সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হযরত শাহজালালের (র.) মাজার। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের শাসনকালে ১৩০৩ সালে হযরত শাহজালালের হাতে এ অঞ্চল বিজিত হয়। সেই সময়ে তুরস্কের কুনিয়া শহর থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে ৩১৩ জন শিষ্যসহ এই দেশে আসেন। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়। মাজার কমপ্লেক্সের ভেতরে শত শত জালালি কবুতর, পুকুরভর্তি গজার মাছ ছাড়াও হযরত শাহজালালের ব্যবহৃত তলোয়ার রক্ষিত আছে। প্রতিবছর হযরত শাহজালাল মাজার জিয়ারতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঢল নামে।

মাজার মসজিদ

হযরত শাহজালালের মাজার প্রাঙ্গণে প্রাচীন মসজিদ। বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে মসজিদটি বর্তমানে আধুনিক রূপ নিলেও এটি সর্বপ্রথম নির্মাণ হয়েছিল ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে।

হযরত শাহপরাণের (র.) মাজার

হযরত শাহপরাণ (র.) ছিলেন হযরত শাহজালালের ভাগনে। তিনিও ছিলেন একজন সাধক পুরুষ। শহরের পূর্ব দিকটায় দক্ষিণগাছের খাদিমপাড়ায় এই মাজার অবস্থিত। বিশাল বটগাছের ছায়াতলে এই মাজার। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তের পদচারণায় মুখরিত থাকে পুরো মাজার এলাকা।

ক্বিন ব্রিজ

সুরমা সেতু নামেও এটি বেশ পরিচিত। লোহার তৈরি এই সেতুটি ১৯৩৬ সালে নির্মাণ করা হয়। তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর মাইকেল ক্বিনের নামে এর নামকরণ। ১১৫০ ফুট লম্বা এবং ১৮ ফুট প্রস্থ এই সেতুটি দেখতে ধনুকের মতো বাঁকানো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ব্রিজটির একাংশ উড়িয়ে দেয়। পরে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থায়নে বিধ্বস্ত অংশটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশাববিদ্যালয় সিলেট শহরের পাশে কুমারগাঁও এলাকায় অবস্থিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘুরতে যেতে পারেন। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলামেলা ক্যাম্পাস ভালো লাগবে।

সুরমা নদী

সিলেট শহরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বাংলাদেশের অন্যতম নদী সুরমা। শহরের চাঁদনী ঘাট থেকে সুরমা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

আলী আমজদের ঘড়িঘর

ক্বিন ব্রিজের উত্তর পাড়ে সুরমা নদীর তীরের চাঁদনীঘাটে প্রাচীন ঘড়িঘর। এটি নির্মাণ করেছিলেন সিলেটের কুলাউড়ার পৃথিমপাশার জমিদার আলী আমজদ খান। দিল্লির চাঁদনী চকে শাহজাদী জাহানারার নির্মিত ঘড়িঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন বলে কথিত আছে।

লাক্কাতুরা চা-বাগান

সিলেট শহর থেকে বিমানবন্দর যেতে পথেই লাক্কাতুরা চা-বাগান। ন্যাশনাল টি কোম্পানির মালিকানাধীন এই চা-বাগান খুবই সুন্দর। সরকারি এই চা বাগানটি প্রায় ৩২০০ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত।

অসংখ্য চা গাছ ও উঁচুনিচু পাহাড়ে ঘেরা লাক্কাতুরা চা বাগান দেশের বৃহত্তম চা বাগানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ওসমানী এয়ারপোর্ট রোড থেকে ডানদিকে এগোলে লাক্কাতুরা চা বাগানের মূল প্রবেশদ্বার নজরে পড়বে। বাম দিকে রয়েছে চা ফ্যাক্টরি ও রাবার বাগান।

চা বাগানে আরও আছে কমলা, সুপারি, ট্যাং ফল, আগর, আতরসহ অনেক ধরনের গাছগাছালি। স্থানীয় সিলেট থেকে স্থানীয় পরিবহণে সহজেই লাক্কাতুরা চা বাগানে যাওয়া যায়।

মালনিছড়া চা-বাগান

বিমানবন্দর সড়কেই আরেক চা-বাগান মালনিছড়া। এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো চা-বাগান। ১৮৫৪ সালে ইংরেজ হার্ডসনের হাত ধরে যাত্রা শুরু এই বাগানের।

টিলাঘেরা এই চা-বাগানের ভেতরটা ছবির মতো সাজানো। প্রচুর বানর আছে এই বাগানে। এই চা বাগানটি বেসরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেও সুন্দর সময় কাটানোর জন্য পর্যটকদের কাছে পছন্দের স্থান হিসাবে সুপরিচিত পেয়েছে।

সিলেট শহরের যে কোনো প্রান্ত থেকে রিকশা, অটোরিকশা বা সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করে মালনিছড়া চা বাগানে যেতে পারবেন। আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে অটোতে চড়ে ১০ মিনিটি এবং রিকশায় ২৫ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

মণিপুরি জাদুঘর

শহরের সুবিদবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই জাদুঘর। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায় মণিপুরিদের শত বছরের কৃষ্টি আর ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এই জাদুঘরের মাধ্যমে। দেখা মিলবে কয়েকশ বছরের পুরনো ঘণ্টা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নানান দ্রব্যসামগ্রী, যুদ্ধে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প সামগ্রীসহ আরও অনেক কিছু।

এমসি কলেজ

সিলেট শহরে অবস্থিত প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুরারীচাঁদ কলেজ বা সিলেট এমসি কলেজ। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশাল জায়গাজুড়ে এই কলেজের ক্যাম্পাসে এখনও আছে অনেক পুরনো স্থাপনা।

ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর

সিলেট শহরের কোর্ট পয়েন্টের কাছে নাইওরপুলে আছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর বাস ভবন 'নুর মঞ্জিল'। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পরিচালনায় এই ঘরে বসেছে ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর। খোলা থাকে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। আর অক্টোবর থেকে মার্চ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। শুক্রবার খোলা থাকে বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে জাদুঘর বন্ধ থাকে।

শুকতারা প্রকৃতি নিবাস

সিলেটের খাদিমনগরের উদ্দীনের টিলায় সবুজে ঘেরা প্রায় ৭ একর জায়গা জুড়ে সবুজ এক স্বর্গ শুকতারা প্রকৃতি নিবাস। সিলেট ভ্রমণে থাকার জন্য এ জায়গাটি উৎকৃষ্ট।

কিভাবে যাবেন

সড়ক, রেল ও আকাশ পথে ঢাকা থেকে সরাসরি সিলেট যেতে পারেন। চট্টগ্রাম থেকেও সিলেটে যাওয়া যায়।

ঢাকার ফকিরাপুল, সায়দাবাদ ও মহাখালী বাসস্টেশন থেকে সিলেটের বাসগুলো ছাড়ে। এই পথে গ্রিন লাইন পরিবহণ, সৌদিয়া, এস আলম পরিবহণ, শ্যামলি পরিবহণ ও এনা পরিবহণের এসি বাস চলাচল করে। এছাড়া শ্যামলী পরিবহণ, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, ইউনিক সার্ভিস, এনা পরিবহণের নন এসি বাস সিলেটে যায়। এনা পরিবহণের বাসগুলো মহাখালী থেকে ছেড়ে টঙ্গী ঘোড়াশাল হয়ে সিলেট যায়।

ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আন্তঃনগর ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, কালনী এক্সপ্রেস ও উপবন এক্সপ্রেস সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ও উদয়ন এক্সপ্রেস সিলেটে যায়।

ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ, নভোএয়ার এবং ইউএস বাংলা এয়ারের বিমান সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

কোথায় থাকবেন

সিলেট শহরে থাকার জন্য বেশ কিছু ভালো মানের হোটেল আছে। শহরের নাইওরপুল এলাকায় হোটেল ফরচুন গার্ডেন জেল সড়কে হোটেল ডালাস, ভিআইপি সড়কে হোটেল হিলটাউন, লিঙ্ক রোডে হোটেল গার্ডেন ইন, আম্বরখানায় হোটেল পলাশ, দরগা এলাকায় হোটেল দরগাগেইট, হোটেল উমি, জিন্দাবাজারে হোটেল মুন লাইট, তালতলায় গুলশান সেন্টার।

কী খাবেন

সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকার পানসী, পাঁচ ভাই কিংবা পালকি রেস্টুরেন্টে পছন্দ মতো নানা রকম দেশি খাবার খেতে পারেন। এসব রেস্টুরেন্টের বাহারি খাবার পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া সিলেট শহরে বিভিন্ন মানের রেস্টুরেন্ট আছে, আপনার পছন্দ মতো যে কোনো জায়গায় খেয়ে নিতে পারেন।

মনে রাখবেন

- চা বাগানের বাংলো বা কারখানা ঘুরে দেখতে হলে আগেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। তবে শুধু চা বাগান ঘুরে দেখতে অনুমতি দরকার হয় না।
- নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলুন।
- চা-বাগানে জোঁক ও পোকামাকড়ের উপদ্রব রয়েছে। এজন্য চা বাগান ঘুরে দেখার সময় সর্তক থাকতে হবে। ◆

তামাবিল

সিলেটের যতগুলো দর্শনীয় স্থান আছে তার মধ্যে তামাবিল অন্যতম। চারপাশে সবুজ পাহাড় আর তার মাঝে স্বচ্ছ পানির লেক আপনাকে দেবে অন্যরকম এক অনুভূতি। তামাবিল সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। সিলেট শহর থেকে সড়ক পথে দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। এটি জাফলং জিরো পয়েন্ট নামেও পরিচিত। সিলেট-জাফলং রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকলে জাফলংয়ের পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে তামাবিলের দেখা মিলবে।

সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখান থেকে সরাসরি ভারতের পাহাড় পর্বত, ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখা যায়। সীমান্তের ওপারে অনেকগুলো জলপ্রপাত রয়েছে। এগুলো বিকাল বেলা ও গোধূলীর সময় দেখতে খুবই সুন্দর। নয়নাভিরাম এসব দৃশ্য দেখতে প্রতিদিন শত শত পর্যটক ভীড় জমায় তামাবিল সীমান্তে। ভারত থেকে বাংলাদেশে কয়লা আসে তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে। তামাবিলের ওপারে ভারতের মেঘালয় রাজ্য।

তামাবিলে যাওয়ার পথের বাঁকে বাঁকে বিশাল পাহাড় ও ঝরনার এক পলক দর্শন আপনাকে মুগ্ধ করবে। প্রকৃতির আয়োজন ছাড়াও তামাবিলের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য আছে স্বচ্ছ পানির লেক, তামাবিল জিরো পয়েন্ট ও জৈন্তিয়া হিল রিসোর্ট।

কিভাবে যাবেন

সিলেট নগরীর যেকোনো স্থান থেকে জাফলংগামী যানবাহনে তামাবিল যেতে পারবেন। সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যেতে পারবেন। ভাড়া একটু বেশি পড়বে। এছাড়া মাইক্রোবাস সারাদিনের জন্য রিজার্ভ নিতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

তামাবিলে জৈন্তিয়া হিল নামে ভালোমানের একটি রিসোর্ট রয়েছে। এছাড়া জাফলংয়ের গেস্ট হাউস ও জেলা পরিষদের বাংলোতে আগেই বুকিং দিয়ে থাকতে পারবেন। তবে সকালে রওনা হলে তামাবিল ঘুরে বিকাল/সন্ধ্যার মধ্যেই সিলেট শহরে ফিরে আসা যায়। তাই রাতে থাকার জন্যে সিলেট শহরে ফিরে আসাই ভালো।

কোথায় খাবেন

স্থানীয় পর্যায়ের বিখ্যাত খাবার হলো আখনি পোলাও এবং সাতকরা।

এখানে স্থানীয় হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু উন্নতমানের হোটেল রয়েছে।

তবে পর্যাটকরা সচরাচর সিলেট শহরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। ◆

জাফলং

সিলেটের সীমান্তবর্তী গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত অন্যতম পর্যটন এলাকা জাফলং। সারা বছরই এখানে কমবেশি পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। জাফলংয়ের প্রধান আকর্ষণ মেঘালয় পাহাড়ের কোলে পিয়াইন নদ ষড়্ঋতুর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বর্ষায় পিয়াইনে উপচেপড়া পানি থাকলেও শীতে ভিন্ন রূপ। স্বচ্ছ পানি আর পাথরের মিতালি দেখতে শীতে জাফলংয়ে বেড়াতে এসে ভ্রমণপিপাসুরা নিতে পারেন প্রকৃতির আরেক স্বাদ। জাফলংকে প্রকৃতির কন্যাও বলা হয়। সারিবদ্ধ চা বাগান, চারদিকে সবুজের সমারোহ, উঁচু-নিচু পাহাড়-টিলা, গহিন অরণ্য আর ঝরনাধারা রয়েছে এখানে।

খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা পিয়াইন নদের স্বচ্ছ পানির ধারা, ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, উঁচু পাহাড়ে সাদা মেঘের খেলা জাফলংকে করেছে অনন্য। পিয়াইন নদের কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও অথই পানি। ওদিকে পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে মায়াবী ঝরনা। একেক ঋতুতে জাফলং একেক রকম রূপের প্রকাশ ঘটায়।

সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় জাফলং অবস্থিত। এর অপর পাশে ভারতের ডাউকি অঞ্চল। ডাউকি অঞ্চলের পাহাড় থেকে ডাউকি নদী জাফলং দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ওপারে ভারতীয় পাহাড় টিলা, ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরাম-ধারায় প্রবাহমান জলপ্রপাত দেখতে প্রতিদিনই দেশি-বিদেশি পর্যটকরা ছুটে আসেন এখানে।

সিলেট নগরী থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলায় জাফলংয়ের অবস্থান। জাফলংয়ে শীত ও বর্ষা মৌসুমের সৌন্দর্যের রূপ ভিন্ন। বর্ষায় জাফলংয়ের রূপ লাবণ্য যেন ভিন্ন মাত্রায় ফুটে উঠে।

যাবেন যেভাবে

সিলেট থেকে জাফলংয়ের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। সিলেট থেকে সরাসরি জাফলং যেতে সময় লাগবে প্রায় দেড় ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা। বাস, সিএনজিচালিত অটো, লেগুনা বা মাইক্রোবাসে জাফলং যেতে পারবেন। জাফলংগামী বাস ছাড়ে কদমতলী থেকে। লোকাল এবং গেটলক বিরতীহীন বাসও চলাচল করে। আপনার সুবিধা মতো চাইলে সিলেট শহরের সোবহানীঘাট থেকেও বাসে উঠতে পারবেন।

রিজার্ভ গাড়িতে যেতে চাইলে সিএনজিচালিত অটো, লেগুনা বা মাইক্রোবাস পাবেন বন্দরবাজার শিশুপার্কের সামনে থেকে। এছাড়া সিলেটের প্রায় সব জায়গা থেকেই রিজার্ভ যাওয়ার গাড়ি পাবেন। পিকনিকের জন্য বা পরিবার নিয়ে বেড়াতে গেলে বাস বা প্রাইভেটকার নিয়ে সরাসরি জাফলং পর্যন্ত যেতে পারবেন। বর্তমানে জাফলং যাওয়ার রোড বেশ ভালো।

কোথায় থাকবেন

সাধারণত জাফলং ভ্রমণকারী পর্যটকরা রাতযাপনের জন্য সিলেট শহরেই ফিরে আসেন। তাই সেখানেই পছন্দ মতো হোটেল থাকতে পারেন।

কোথায় খাবেন

জাফলংয়ে বেশ কয়েকটি খাবার হোটেল রয়েছে। এসব হোটেলে ভাত মাছ ও দেশীয় খাবার পাওয়া যায়। তবে জাফলংয়ে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সিলেট থেকে নাস্তা করে নিলে সারাদিন ঘুরে সিলেটে ফিরে এসে রাতের খাবার খেতে পারবেন। তবে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য স্থানীয় হোটেলই একমাত্র ভরসা। ◆

নীল পানির লালাখাল

লালাখাল সিলেটের সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি কারো কাছে সারি নদ, কারো কাছে লালাখাল, আবার কারো কাছে নীলনদ নামেই পরিচিত। পাহাড়ঘেরা স্বচ্ছ এই নদের পানির রঙ নীল। নদীর গভীরতা যেখানে বেশি, পানির রঙ সেখানে গাঢ় নীল।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি লালাখাল। প্রকৃতিকে একান্তে অনুভব করে শীতল হতে লালাখালের জুড়ি মেলা ভার। এই নদীর গা-ঘেঁষে উঁচু-নিচু পাহাড়। পাহাড়ে ঘন সবুজ বন, পাখ-পাখালি। এক কথায় নদী, পাখ-পাখালি ও নানা জাতের বৃক্ষের সমাহার লালাখালজুড়ে। নীল পানি আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া এখানকার মানুষের জীবনযাত্রাও চোখে পড়ার মতো। এ ছাড়া বাড়তি পাওনা আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমানোর সুযোগ। সিলেট থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে ভারতের চেরাপুঞ্জির ঠিক নিচেই লালাখালের অবস্থান। চেরাপুঞ্জি পাহাড় থেকে উৎপন্ন এ নদ বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

লালাখালের জিরো পয়েন্টে রয়েছে সুন্দর এক চা-বাগানসহ ফ্যাক্টরি। কাছেই আছে সুপারি বাগান। বাগানের পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ আপনাকে নিয়ে যাবে অচেনা এক দেশে। একটু এগোলেই ওপারে ভারতের সীমান্ত আপনাকে জানিয়ে দেবে, আর এগোনোর পথ নেই।

শীত-বসন্তের মাঝামাঝি সময়টা লালাখাল ভ্রমণের জন্য সঠিক সময়। শীতের শুরু থেকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদের নীল স্বচ্ছ পানি চোখে পড়ে। শুকনো মৌসুমে নদের অনেক স্থানে ভেসে ওঠে চর।

ভরা পূর্ণিমায় মেঘ, পাহাড় আর নদীর মিতালী দেখতে লালাখাল ঘুরে আসতে পারেন। লালাখালের বিভিন্ন অংশে নীল, সবুজ এবং স্বচ্ছ পানির দেখা মিলে। চাইলে তামাবিল অংশের স্বচ্ছ পানির সারি নদীর ওপর দিয়ে স্পিডবোট বা নৌকায় লালাখালে যেতে পারেন। ৪৫ মিনিটের এ যাত্রা আপনাকে লালাখালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে রাখবে। সন্ধ্যার পর নদীতে নৌকা থাকে না, তাই সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে যাওয়া উত্তম। রাতে লালাখালের রূপে মোহিত হতে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যেভাবে যাবেন

সিলেট আর জাফলংয়ের মাঝামাঝি সারিঘাট। লালাখালে যেতে হলে সিলেটের শিশুপার্কের সামনে থেকে লেগুনা অথবা জাফলংয়ের বাসে সিলেট-তামাবিল সড়ক ধরে যেতে হবে সারিঘাট। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া নিতে পারেন। নৌপথে যেতে চাইলে আগে সারিঘাট পর্যন্ত একই নিয়মে বাস বা লেগুনায় গিয়ে নৌযান ভাড়া নিতে হবে। ফেরার পথে এখান থেকে বাসে কিংবা লেগুনায় আসতে পারবেন। রাত ৮টা পর্যন্ত যানবাহন পাওয়া যাবে।

কোথায় থাকবেন

লালাখালে একটিমাত্র রিসোর্ট রয়েছে। তাই আগে থেকে বুকিং না দিলে জায়গা পাওয়া কঠিন। এ ছাড়া সিলেট শহরে রাত যাপন করে এক দিনেও লালাখাল ঘুরে আসতে পারেন অনায়াসে। অথবা সকালে বিছানাকান্দি হয়ে বিকালে লালাখাল ঘুরতে পারেন। সন্ধ্যার দিকে নদীতে কোনো নৌকা থাকে না। তাই ভ্রমণ বা ঘোরাঘুরি সন্ধ্যার আগেই শেষ করতে হবে।

সাবধানতা

- লালাখালের পানিতে নামার সময় পানির গভীরতা খেয়াল রাখবেন।
- প্রয়োজনে গাইড কিংবা সঙ্গে যাওয়া কারও পরামর্শ নিন।
- পানিতে প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের প্যাকেট বা ময়লা জাতীয় কোনো কিছু ফেলবেন না। ◆

বিছানাকান্দি

সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলা গোয়াইনঘাটের রস্তমপুর ইউনিয়নে অবস্থিত বিছানাকান্দি। পানি-পাথরের শয্যাখ্যাত এই পর্যটনকেন্দ্র ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। বর্ষায় এক, শীতের আরেক রূপ ধারণ করে সবুজ পাহাড়ের কোলে পাথুরে বিছানাকান্দির পিয়ান নদ। ভরা বর্ষায় পাহাড়ের বুক চিরে আসা বিছানাকান্দিতে পাথরের মাঝ দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ পানির আওয়াজ থাকলেও শীতে প্রায় পানিহীন পাথুরে বিছানাকান্দি। ক্ষণে ক্ষণে নানা রূপে ধরা দেয় পর্যটকদের চোখে। বিছানাকান্দির পুরো এলাকায় পড়ে আছে ছোট-বড় পাথর। পাহাড়ের কোলে এ যেন পাথরের বিছানা। শীতে বেড়াতে আসা ভ্রমণপিপাসুর মন কাড়বে শীতের বিছানাকান্দি।

সিলেট শহর থেকে বিছানাকান্দির দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। বর্ষা মৌসুমে পাহাড়গুলো একটু বেশিই সবুজ, পাহাড়ের গায়ে ঝরনাগুলোও প্রাণবন্ত। তবে এসব ঝরনার কাছে গিয়ে পানি ছোয়ার সুযোগ নেই। শুধুই দুই চোখ ভরে উপভোগ করা। কারণ সবগুলোই ভারতে।

সিলেট শহর থেকে হাদারপাড় হয়ে গেলে পিয়াইনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যাওয়া যাবে। বিছানাকান্দিতে প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্যের সবটুকুই ঢেলে দিয়েছেন অপার মহিমায়। চারিদিকে শুধুই সবুজ আর সবুজ। ওপরে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। বিছানাকান্দির বিছানায় যেতে যেতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন ভ্রমণপ্রেমী যে কোনো মানুষ।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়

বিছানাকান্দি যেকোনো সময় ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত। তবে বর্ষাকাল বিছানাকান্দি ভ্রমণের জন্য আদর্শ সময়। চারদিকে প্রচুর পানি প্রবাহ থাকার কারণে এই সময় বিছানাকান্দির প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। শীতের বিছানাকান্দি দেখতেও অপরূপ।

যাওয়ার উপায়

বিভিন্ন পথে যাওয়া যায় বিছানাকান্দি। তবে হাদারপাড় থেকে সবচেয়ে সহজ ও ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে। সিলেট শহরের আম্বরখানা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় প্রথমে যেতে হবে হাদারপাড়। সেখান থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় যেতে হবে বিছানাকান্দি।

কয়েকজন মিলে রিজার্ভ নেওয়াই ভালো। তবে দলে লোক কম হলে লোকাল ইঞ্জিনচালিত নৌকাও পাওয়া যাবে।

এছাড়া বিছানাকান্দি যাওয়ার অন্য পথটি হল সিলেট শহর থেকে বাস কিংবা যে কোনো বাহনে চড়ে আগে যেতে হবে জাফলংয়ের পথে সারিঘাট। সেখান থেকে অটোরিকশায় গোয়াইনঘাট হয়ে বিছানাকান্দি।

কোথায় থাকবেন

ঢাকা থেকে রাতের বাসে যাত্রা করে সারাদিন ঘুরে আবার পরের রাতে ফিরতে পারেন। তবে এই জায়গায় সময় নিয়ে বেড়াতে ভালো লাগবে। সারাদিন বেড়ানো শেষে রাতে এসে থাকতে হবে সিলেটে।

কোথায় খাবেন

বিছানাকান্দিতে কিছু অস্থায়ী খাবারের হোটেল রয়েছে।

প্রয়োজনে সাথে কিছু শুকনো খাবার, পানি ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেতে পারেন। এছাড়া সিলেট শহরে বিভিন্ন মানের রেস্টুরেন্ট আছে, আপনার চাহিদা মতো সবকিছুই পাবেন।

সাবধানতা

- বর্ষায় পাহাড়ি ঢল থাকে বলে পিয়াইন নদে। এ সময় স্রোত খুব বেশি। তাই বিছানাকান্দি যাওয়ার পথে ছোট নৌকা এড়িয়ে চলা উচিত। ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ভালো।
- এখানকার নৌকাগুলোতে লাইফ জ্যাকেট থাকে না। যারা সাঁতার জানেন না, সঙ্গে অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট নেবেন।
- বিছানাকান্দি জায়গাটি আসলে নোম্যানস ল্যান্ডঘেঁষা। সীমান্তে চলাচলের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সীমান্ত যাতে অতিক্রম না করেন সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি হয় এমন কিছু করবেন না।
- স্থানীয়দের সাথে বিনয়ী থাকুন।
- সন্ধ্যার আগেই সিলেট শহরে ফিরে আসুন। ◆

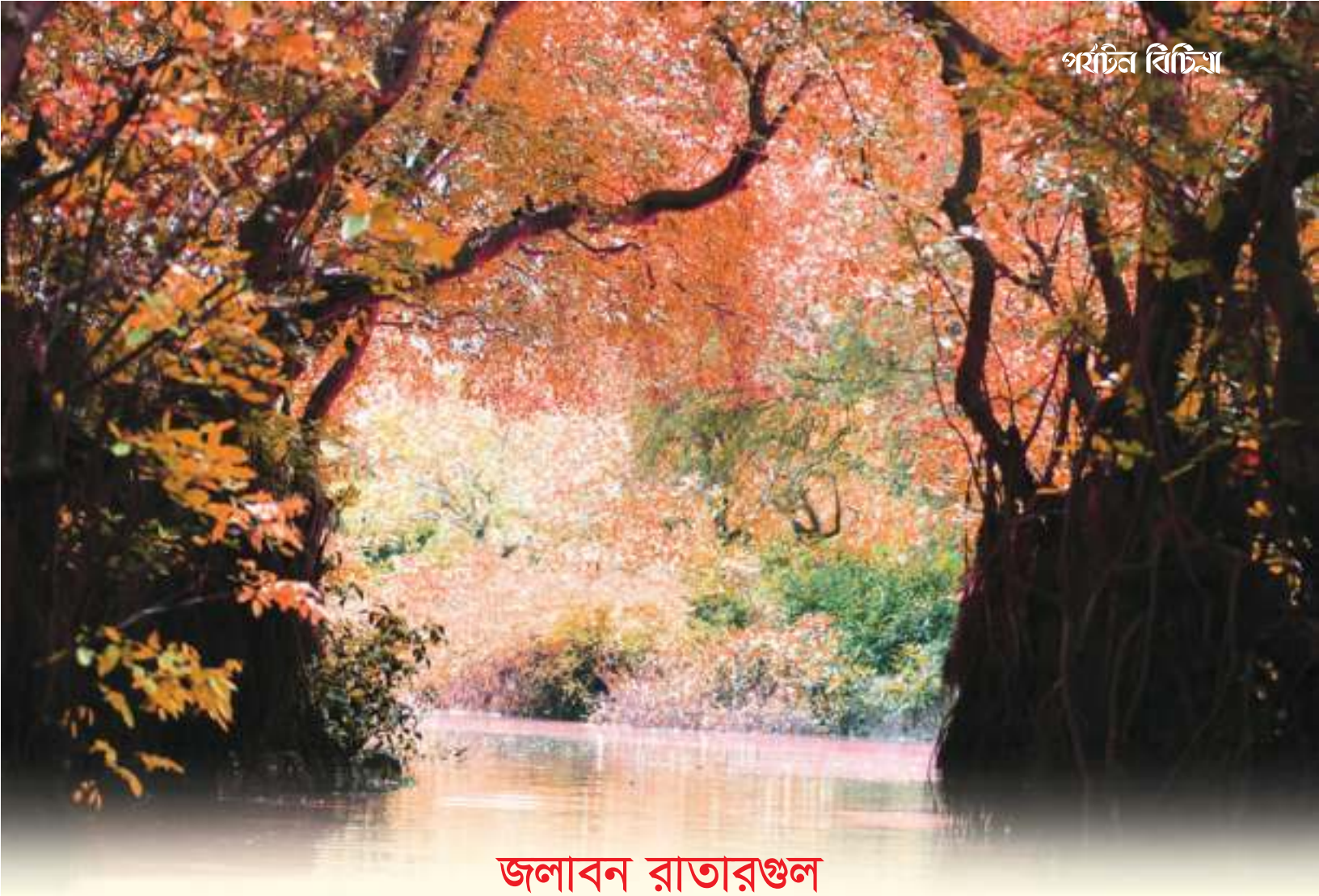

জলাবন রাতারগুল

বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির জলাবন রাতারগুল। এটি সিলেট জেলা শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। 'সিলেটের সুন্দরবন' খ্যাত প্রায় ৩৩১ একর আয়তনের রাতারগুল বন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা এই বনে হিজল, করচসহ ৭৩ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২০ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৭৫ প্রজাতির পাখি ও ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে।

বর্ষায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রাতারগুল। পানির ওপর এমন বনে রয়েছে এক ধরনের বুনো সৌন্দর্য। পর্যটকদের কাছে এর আবেদন অন্য রকম। হিজল-করচের নিবিড় মমতা রোমাঞ্চের শিহরণ জাগায় পর্যটকদের মনে। তাই জলে ভাসা রাতারগুল বন হাতছানি দেয় পর্যটকদের।

রাতারগুল জলাবন বছরে চার থেকে পাঁচ মাস পানির নিচে থাকে। বর্ষায় গাছের ডালে দেখা মেলে নানান পজাতির পাখি। কিছু বন্যপ্রাণীও আশ্রয় নেয় গাছের ডালে।

আবার শীতকালে রাতারগুলের জলাশয়ে বসে হাজারো অতিথি পাখির মেলা। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর (বর্ষার শেষের দিকে) পর্যন্ত রাতারগুল ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

পানিতে অর্ধেক গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই বনের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। রাতে কান পাতলেই শেয়ালের হুক্কাহুয়া শোনা যায়। ঝিঁঝিঁ পোকা আর

ব্যাঙের ডাকে মধ্যরাতের রাতারগুল জলাবন বেশ রহস্যময় হয়ে উঠে। সারাদিন ভ্রমণের জন্য জায়গাটিতে পাওয়া যাবে ছোট ছোট খোলা নৌকা। সিলেট বন বিভাগের উত্তর সিলেট রেঞ্জ ২-এর অধীন প্রায় তিন হাজার ৩২১ একর জায়গাজুড়ে রাতারগুল জলাবন। এর মধ্যে ৫০৪ একর জায়গায় মূল বন, বাকি জায়গা জলাশয় আর সামান্য কিছু উঁচু জায়গা।

বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৭৩ সালকে রাতারগুল বনের ৫০৪ একর এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করে। এ বনে দেখা যায় নানান প্রজাতির পাখি। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মাছরাঙা, বিভিন্ন প্রজাতির বক, ঘুঘু, ফিঙে, বালিহাঁস, পানকৌড়ি ইত্যাদি।

বন্যপ্রাণীর মধ্যে আছে- বানর, উদবিড়াল, কাঠবিড়ালি, মেছোবাঘ ইত্যাদি। নানান প্রজাতির সাপেরও অভায়শ্রম এই বন।

রাতারগুল জলাবনের একেবারে শুরুর দিকটায় মুর্তার বন। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই খোলা জায়গার পুরোটাই পানিতে ডুবে থাকে। এর পরেই মূল বন।

বনের গহীনে গাছের ঘনত্ব বেশি। কোথাও কোথাও সূর্যের আলো পর্যন্ত পানি ছুঁতে পারে না। কয়েকদিন পাহাড়ি ঢল না থাকলে বনের পানি এত বেশি স্বচ্ছ হয় যে, বনের সবুজ প্রতিবিম্বকে মনে হয় বনের নিচে আরেকটি বন। এই সময়টা রাতারগুলের ছবি তোলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

কিছু পরামর্শ

পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় রাতারগুল জঙ্গল বেড়ানোর উপযুক্ত সময়। এই বনের চারদিকে পানি পূর্ণ থাকে বলে ভ্রমণের সময় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

এই বনে বেড়ানোর সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বনের গাছে ডালে অনেক সময় সাপ থাকে। এছাড়া কম বেশি জোঁকেরও উপদ্রব আছে। সাঁতার না জানলে সঙ্গে লাইফ জ্যাকেট রাখা জরুরি। এছাড়া ছাতা, বর্ষাতি কিংবা পঞ্চ, রোদটুপিও সঙ্গে নিতে হবে। এখানে বেড়ানোর নৌকাগুলো অনেক ছোট। এক নৌকায় পাঁচজনের বেশি উঠবেন না। ◆

রাতারগুলে বেড়াতে দিতে হবে 'ফি'

রাতারগুলের বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকায় প্রবেশের পাশাপাশি ভিডিও ধারণ এবং নৌকা ভ্রমণ করতে চাইলে ফি দিতে হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয় বনটির বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকায় প্রবেশ, পার্কিং, ভিডিও ধারণ এবং নৌকা ভ্রমণের ফি নির্ধারণ করে ২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর গেজেট প্রকাশ করে।

এজন্য রাতারগুলের বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকায় প্রবেশ করতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ৫০ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক (১২ বছরের নিচে) ও পরিচয়পত্রধারী শিক্ষার্থীদের ২৫ টাকা করে ফি দিতে হবে। আর বিদেশি নাগরিকদের জন্য প্রবেশ ফি ধরা হয়েছে ৫০০ টাকা।

এছাড়া একদিন একটি ক্যামেরা দিয়ে রাতারগুলের বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকায় শুটিং করতে চাইলে 'ফিল্মিং ফি' দিতে হবে ১০ হাজার টাকা।

দেশি দর্শনার্থীদের প্রতিবার ইঞ্জিনবিহীন নৌকা ভ্রমণের ফি ১০০ টাকা।

বিদেশিদের জন্য এই ফি ধরা হয়েছে এক হাজার টাকা।

এছাড়া বাস বা ট্রাকের প্রতিবারের পার্কিং ফি ২০০ টাকা। পিকআপ, জিপ, কার ও মাইক্রোবাসের পার্কিং ফি ১০০ টাকা এবং অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের পার্কিং ফি ধরা হয়েছে ২৫ টাকা।

কিভাবে যাবেন

সিলেট শহর থেকে কয়েকটি পথে আসা যায় রাতারগুল। সবচেয়ে সহজ পথটি হলো- শহর থেকে মালনিছড়ার পথে ওসমানী বিমানবন্দরের পেছনের সড়ক ধরে সোজাসাহেব বাজার হয়ে রামনগর চৌমুহনী। সেখান থেকে হাতের বাঁয়ে এক কিলোমিটার গেলেই রাতারগুল। সিলেটের আম্বরখানা, শাহজালাল মাজার থেকে সাহেববাজার কিংবা চৌমুহনী লোকাল অটোরিকশা যায়।

মনভোলানো সাদা পাথর

যতদূর চোখ যায়, কেবল সাদা পাথর, মাঝখানে স্বচ্ছ নীল পানি, ওপরে নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড়ে মেঘের আলিঙন। যেন প্রকৃতির এক অপরূপ স্বর্গরাজ্য। সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলা কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে রয়েছে প্রকৃতির এই রূপের আধার।

সিলেটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান এটি। সেখানকার সাদা পাথর, রোপওয়ে, পাথর কোয়ারি আর পাহাড়ি মনোলোভা দৃশ্য মুগ্ধ করার মতো। ভারতের মেঘালয় রাজ্য থেকে নেমে আসা ধলাই নদের বুকে স্বচ্ছ জল আর সাদা পাথরের মুগ্ধতায় মন ভরে যায় পর্যটকদের।

চারপাশে ছড়িয়ে আছে সাদা পাথর। মনে হয় যেন, প্রকৃতি শুভ্র বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। মাঝখানে স্বচ্ছ নীল পানি। চারদিকে ঘিরে আছে ছোট-বড় কয়েকটি পাহাড়। তার ওপর যেন আছড়ে পড়েছে মেঘ। এ ছাড়া চারপাশে আছে সবুজ প্রকৃতি। সব মিলিয়ে প্রকৃতির যেন অপরূপ এক স্বর্গরাজ্য। পর্যটকরা এই অপূর্ব স্থানটি উপভোগের জন্য ছুটে আসেন সাদা পাথরের দেশে।

ভোলাগঞ্জ সীমান্তে প্রাকৃতিক দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উঁচু উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনাধারা একদিকে ধলাই নদের পানির যোগানদাতা অন্যদিকে এই পানি প্রবাহই ভোলাগঞ্জের রূপের উৎস। সবুজ পাহাড়, মেঘের হাতছানি আর বর্ষার পাহাড়ি ঢলের সাথে নেমে আসা সাদা পাথর ধলাই নদের বুকে মিলে মিশে ভোলাগঞ্জের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। বর্ষায় নদের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরের বিছানা ভরাট নদীর শোভা বাড়িয়ে দেয় হাজারগুণ। সাদা পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ঝরনার পানির তীব্র স্রোতে নয়ন জুড়ায়। অনেকেই সাদা পাথর পর্যটন স্পটকে ছবিতে বিছানাকান্দি ভেবে ভুল করেন!

ধলাই নদের উৎস মুখের পাথর পরিবেষ্টিত জায়গাটুকু ভোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্ট বা সাদা পাথর নামে পরিচিত। সাদাপাথর এলাকাটি দেখতে অনেকটা ব-দ্বীপের মতো। ধলাই নদ বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করে দুভাগে বিভক্ত হয়ে চারপাশ ঘুরে আবার মিলিত হয়েছে। ধলাই নদের পানির সাথে ভারতের খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে প্রচুর পাথর নেমে আসে। পাথর উত্তোলনকে সহজ করতে ১৯৬৪-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে নির্মাণ করা হয়। ভোলাগঞ্জ থেকে সোয়া ১১ মাইল দীর্ঘ এই রোপওয়ে চলে গেছে ছাতক পর্যন্ত, যা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে রোপওয়ের টাওয়ারগুলো কালের স্মৃতিচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। রোপওয়ে বন্ধ হলেও থেমে নেই পাথর উত্তোলন। এখনো অনেক স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকার উৎস এই পাথর উত্তোলন।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়

সারা বছরই সাদা পাথরের দেশে ঘুরতে যেতে পারেন। তবে বর্ষার সময় এ স্থানের সৌন্দর্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময় যাওয়ার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অন্য সময় গেলে সেখানে পাথরের সৌন্দর্য দেখতে পেলেও নদীতে বা ছরায় পানির পরিমাণ কম থাকবে। শীতকালে সাদা পাথর এলাকায় নৌকা চলাচল করার মতো পানি থাকে না। তখন পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে হবে।

কিভাবে যাবেন

সিলেট থেকে ভোলাগঞ্জের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। সিলেট থেকে বাস, সিএনজিচালিত অটো, লেগুনা বা প্রাইভেটকারে করে যাওয়া যায় ভোলাগঞ্জ। বর্তমানে ভোলাগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার অবস্থা অনেকটা ভালো।

সিলেটের আম্বরখানা থেকে অটো ও মজুমদারী এলাকা থেকে ভোলাগঞ্জ যাওয়ার বিআরটিসি, লোকাল ও টুরিস্ট বাস পাওয়া যায়। এসব যানবাহন কোম্পানীগঞ্জের টুকের বাজারে নামাবে। সেখান থেকেই ট্রলারে চলে যেতে পারেন সাদা পাথর। কোম্পানীগঞ্জ পৌঁছে টুকের বাজার ঘাট থেকে ট্রলারে সাদা পাথর পৌঁছতে ৩০ মিনিটের মতো সময় লাগবে। এখানে নৌকা রিজার্ভ করে নিতে হয়, অন্যথায় ভুগতে হবে। সিলেট থেকে ভোলাগঞ্জ সরাসরিও যাওয়া যায়। ১০ মাইল নামক স্থান থেকে নৌকা নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া গুণতে হবে অটোরিকশায়। সিলেটে ফিরে আসার সময় আপনার অবস্থান অনুযায়ী চরারবাজার/ দয়ারবাজার/ ভোলাগঞ্জ থেকে সরাসরি অটো নিয়ে চলে আসতে পারেন সিলেটের আম্বরখানায়।

কোথায় থাকবেন

ভোলাগঞ্জ বা কোম্পানীগঞ্জ থাকার মতো খুব ভালো আবাসিক হোটেল নেই। যদি কোনো কারণে ভোলাগঞ্জে থাকার প্রয়োজন হয় তাহলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সদরে যেতে হবে। সেখানে সাধারণ মানের নন-এসি আবাসিক হোটেল ও জেলা পরিষদের ডাক বাংলো রয়েছে।

তবে সকালে রওনা হলে ভোলাগঞ্জ ঘুরে বিকাল/সন্ধ্যার মধ্যেই সিলেট শহরে ফিরে আসা যায়। তাই রাতে থাকার জন্যে সিলেট শহরে ফিরে আসাই ভালো।

কোথায় খাবেন

ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর কিংবা ১০নং ঘাটে ভালোমানের খাবার হোটেল বা রেস্টুরেন্ট নেই। ভাত মাছ ও দেশীয় খাবার খাওয়ার মতো সাধারণ মানের কিছু হোটেল আছে। ভোলাগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সদরে কয়েকটি মাঝারি মানের খাবার হোটেল আছে। ভোলাগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সিলেট থেকে নাস্তা করে নিলে সারাদিন ঘুরে সিলেটে ফিরে এসে রাতের খাবার খেতে পারবেন। তবে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য স্থানীয় হোটেলই একমাত্র ভরসা।

সতর্কতা

- সন্ধ্যার আগেই সিলেট শহরে ফিরে আসার চেষ্টা করবেন।
- সাদা পাথর কতক্ষণ থাকবেন সেটা নৌকার মাঝিকে আগেই জানিয়ে রাখুন।
- সীমান্তবর্তী জায়গা, তাই সাবধানে থাকতে হবে।
- নদী পথে ভোলাগঞ্জ শুধুমাত্র বর্ষাকালে যাওয়া যায়।
- বর্ষাকালে নদীর পানিতে অনেক স্রোত থাকে, সাঁতার না জানলে বেশি পানিতে নামবেন না। ◆

DHAKA DINNER CRUISE®

ঢাকা ডিনার ক্রুজ

/dhakadinnercruise

নৌবিহার বুকিং চলছে

শীতলক্ষ্যা, পদ্মা, মেঘনা, কাপ্তাইলেক ও টাঙ্গুয়ার হাওর

আমাদের সেবাসমূহ

- নিয়মিত ডিনার ক্রুজ
- নিয়মিত ডে ক্রুজ
- বার-বি-কিউ ডিনার
- ফেয়ার ওয়েল ডিনার
- অফিসিয়াল কনফারেন্স
- জন্মদিন ও বিবাহ উৎসব
- অন্যান্য সেবাসমূহ।

যাত্রা শুরু

পূর্বাচল রাজউক অফিস

(কাঞ্চন ব্রীজ সংলগ্ন)

(৩০০ ফিট রাস্তা ধরে মাত্র ২০ মিনিটের যাত্রা)

- **ভ্রমণ মূল্যঃ ২৫০০++**
  (ডিনার ক্রুজ / ডে ক্রুজ)
- **ভ্রমণ মূল্যঃ ৩৫০০++**
  (দিনব্যাপী)

শর্ত প্রযোজ্য**

ঢাকা ক্রুজ এন্ড লজিস্টিকস

কর্পোরেট অফিস

বাড়ি-৯৭/১, ২য় তলা, শুক্রাবাদ
ঢাকা-১২০৭

dhakadinnercruise@gmail.com
info@dhakadinnercruise.com

www.dhakadinnercruise.com

বুকিংঃ ০১৭৩০৪৫০০৯৯, ০১৮১৯২২৪৫৯৩, ০১৭০৮৪২৭৭৯৭

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে অনেক পর্যটক আকর্ষণীয় ভ্রমণ স্থান ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। পর্যটন শিল্পের জন্য এই জেলার বাংলাদেশের সভ্যতা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে অবদান অনেক। দৃষ্টিনন্দন চা-বাগান, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আপন মহিমায় এই জেলা অন্য জায়গা থেকে আলাদা। মৌলভীবাজারে সারা বছর পর্যটকদের যাতায়াত থাকলেও শীত মৌসুমে তা বেড়ে যায়। এ সময় পর্যটকদের পদচারণায় পূর্ণতা পায় জেলার পর্যটনকেন্দ্রগুলো। তাই ভ্রমণপিপাসু মানুষ সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন এই জেলায়।

মৌলভীবাজারের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমানের স্মৃতিসৌধ, হযরত শাহ মোস্তফার (র:) মাজার শরিফ, পৃথিমপাশা নবাববাড়ী, মনু ব্যারেজ, মাধবপুর চা-বাগান লেক, কমলা/লেবু/আনারস বাগান, পাহাড়, টিলা, হাওড় ও বিলের সমাহার।

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সুউচ্চ জলপ্রপাত হিসেবে পরিচিত। অনিন্দ্য সুন্দর এই জলপ্রপাত প্রায় ১৬২ ফুট উঁচু। এটি দেখতে প্রতিদিন অনেক পর্যটকের সমাগম ঘটে এখানে। এই ছড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। সাধারণত একটি মূলধারায় পানি সব সময়ই পড়তে থাকে, বর্ষা এলে মূলধারার পাশেই আরেকটা ছোট ধারা তৈরি হয় এবং ভরা বর্ষায় দুটো ধারাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পানির তীব্র তোড়ে। জলের এই বিপুল ধারা পড়তে পড়তে নিচে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কুণ্ডের। এই মাধবছড়ার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে হতে গিয়ে মিশেছে হাকালুকি হাওড়ে। জলপ্রপাতের পাশেই রয়েছে শিবমন্দির।

সরকারি উদ্যোগে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রেস্ট হাউস ও রেস্টুরেন্ট। ২৬৭ একর এলাকাকে নিয়ে ২০০১ সালে মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাধবকুণ্ড ইকোপার্কেও মেইন গেট থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলে মাধবকুণ্ড ঝরনার দেখা মিলবে। মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক ঘুরে দেখতে বেশ উপভোগ্য। এখানে আছে শ্রী শ্রী মাধবেশ্বরের তীর্থস্থান, চা-বাগান, খাসিয়া পল্লী, কমলা, লেবু, সুপারি ও পানের বাগান। কোথাও কোথাও জুম চাষের দেখাও মিলবে।

পরিকুণ্ড জলপ্রপাত

মাধবকুণ্ড ঝরনা থেকে কিছুটা দূরত্বে রয়েছে পরিকুণ্ড ঝরনা। ঝিরি ধরে ১০-১৫ মিনিট হেঁটে গেলেই সেই ঝরনার কাছে যাওয়া যায়। গভীর বন ও প্রচার না থাকায় ১৫০ ফুট উঁচু পাহাড় হতে নেমে আসা পানির ধারা দেখতে খুব বেশি পর্যটকের চলাচল নেই। এই ঝরনাটি সবার কাছে খুব বেশি পরিচিত না হলেও এর বুনো সৌন্দর্যের কোনো কমতি নেই।

যাওয়ার সময়

ভ্রমণের জন্যে শীতকাল উপযুক্ত সময় হলেও ঝরনাতে শীতকালে পানি কম থাকে। সেই দিক বিবেচনায় বর্ষা বা তার আশপাশের সময়ে গেলে তখন অনেক পানি থাকবে।

যাওয়ার উপায়

ঢাকার সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকা-বিয়ানীবাজার রুটের অনেক ভালো মানের চেয়ারকোচ বাস আছে। এর মধ্যে আছে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, শ্যামলী। এছাড়া এনা পরিবহণের বাসও আছে। সরাসরি বাসে গেলে বড়লেখার একটু আগে কাঁঠালতলী বাজারে নামবেন। এখান থেকে মাধবকুণ্ড বেশি দূরে নয়। তবে আপনাকে মাধবকুণ্ড চূড়ার কাছে যেতে হলে এখান থেকে অবশ্যই সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা রিকশা নিতে হবে। এছাড়া আপনি চাইলে কমলাপুর থেকে ট্রেনেও

যেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে ঢাকা-সিলেটের আন্তঃনগর ট্রেনে উঠতে হবে এবং কুলাউড়া স্টেশনে নামতে হবে। ট্রেনগুলোর মধ্যে আছে জয়ন্তিকা, পারাবত, উপবন। কুলাউড়া থেকে মাধবকুণ্ডের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। আপনি এখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা রিজার্ভ করে সরাসরি মাধবকুণ্ডে যেতে পারেন।

মৌলভীবাজার থেকে মাধবকুণ্ড: মৌলভীবাজার শহর থেকে মাধবকুণ্ড দুইভাবে যেতে পারেন। সিএনজি/জিপ/মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে নিতে পারেন অথবা বড়লেখাগামী কোনো লোকাল বাসে উঠে কুলাউড়া পার হয়ে বড়লেখার আগেই কাঁঠালতলী বাজারে নেমে যাবেন। সেখান থেকে রিজার্ভ/লোকাল সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যেতে পারবেন মাধবকুণ্ড।

সিলেট থেকে মাধবকুণ্ড: সিলেট থেকে মাধবকুণ্ড যেতে চাইলে কদমতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে বড়লেখা হয়ে যে বাস কুলাউড়া যায় সেই বাসে উঠতে পারেন অথবা বড়লেখা যেতে পারেন। বড়লেখা থেকে রিজার্ভ সিএনজিচালিত অটো দিয়ে মাধবকুণ্ড যেতে পারবেন অথবা বড়লেখা থেকে লোকাল অটো দিয়ে কাঠালতলী বাজার গিয়ে সেখানে থেকে রিজার্ভ/লোকাল অটোতে মাধবকুণ্ড যেতে পারেন।

শ্রীমঙ্গল থেকে মাধবকুণ্ড: শ্রীমঙ্গল থেকে মাধবকুণ্ড যেতে চাইলে সরাসরি সিএনজিচালিত অটো/জিপ রিজার্ভ করে যেতে পারেন। অথবা বড়লেখাগামী কোনো লোকাল বাসে করে বড়লেখার আগে কাঁঠালতলী বাজারে নেমে যেতে হবে। সেখান থেকে রিজার্ভ/লোকাল অটোতে মাধবকুণ্ড যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

মাধবকুণ্ডে থাকার জন্য জেলা পরিষদের দুইটি বাংলো ও দুইটি আবাসিক হোটেল রয়েছে। অগ্রিম বুকিং দিয়ে থাকতে পারবেন সেখানে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় সিলেট, মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গলে রাতযাপন করা।

কোথায় খাবেন

মাধবকুণ্ডে মাঝারি মানের রেস্তোরাঁ আছে। এছাড়া সিলেট, মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গল শহরেও অনেক মানের খাবার হোটেল আছে। আপনার পছন্দ মতো কোনো হোটেল থেকে খেয়ে নিতে পারেন।

হামহাম জলপ্রপাত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গভীরে কুরমা বন বিট এলাকায় হামহাম জলপ্রপাতটি অবস্থিত। ২০১০ সালের শেষের দিকে দুর্গম জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে একদল পর্যটক আবিষ্কার করেন এটি। স্থানীয়দের কাছে এই ঝরনাটি চিতা ঝরনা হিসেবে পরিচিত। শীতকালে তুলনামূলক পানি অনেক কম থাকে। বর্ষাকালে ১৪০ ফুট উঁচুর হামহামের সৌন্দর্য দেখার উপযুক্ত সময়।

কিভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে হামহাম যেতে হলে শ্রীমঙ্গল হয়ে যাওয়া সবচেয়ে সুবিধাজনক। শ্রীমঙ্গল থেকে প্রথমে কলাবন পাড়ায় যেতে হবে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা জিপে কলাবন পাড়া পৌঁছে একজন ভালো গাইড ঠিক করে নিন। কলাবন পাড়া থেকে হামহাম যাওয়ার দুইটি পথ আছে। ঝিরি পথ ও পাহাড়ি পথ। ঝিরি পথে একটু সময় বেশি লাগলেও এই পথের সৌন্দর্য পাহাড়ি পথের চেয়ে অনেক বেশি। তবে বর্ষাকালে ঝিরি পথে অনেক জোঁক থাকে। কলাবন পাড়া থেকে হামহাম যেতে ২-৩ ঘণ্টা লাগবে।

কোথায় থাকবেন

হামহাম ঝরনার আশপাশে থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই খুব সকালে রওনা দিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসাই ভালো। শ্রীমঙ্গলে থাকার জন্য বিভিন্ন মানের হোটেল আছে।

কী খাবেন

কলাবন পাড়ায় ছোট একটি হোটেল আছে। খিদে মেটানোর জন্য কলাবন পাড়ায় কিছু খাবার খেয়ে নিতে পারেন। হামহাম ঝরনার পাদদেশে চা, ছোলাবুট পাওয়া যায়।
এছাড়া সাথে শুকনো খাবার নিয়ে যেতে পারেন। শ্রীমঙ্গল ফিরে শহরে ভালো মানের রেস্টুরেন্ট খেতে পারেন।

সাবধানতা

- ঝরনার আশপাশের পাথর অনেক পিচ্ছিল। তাই চলাচলের ক্ষেত্রে সাবধান থাকবেন।
- নোটিশ বোর্ডে যা লেখা আছে তা পালন করুন।
- জলপ্রপাতের নিচে অনেক গভীর, ভুলেও সেখানে যাবেন না।
- বর্ষায় ঝিরিতে অনেক স্রোত থাকে। সাবধানে সাঁতার কাটবেন।

পাথারিয়া পাহাড়

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার ভারতীয় সীমান্ত লাগোয়া পাথারিয়া পাহাড়। দুর্গম এই পাহাড়ের ঘন সবুজ অরণ্যের বুক চিড়ে বেরিয়ে এসেছে অর্ধশতাধিক ঝরনা। স্থানীয়রা আদর করে নাম দিয়েছেন ঝেরঝেরি, কাখড়াছড়ি, ফুলঢালনি আর ইটাউরি ফুলবাগিচা ঝরনা। এই ঝরনাগুলো পাথারিয়া পাহাড়কে সাজিয়েছে অন্যরকম সৌন্দর্যে। স্থানীয়দের কাছে 'আদম আইল' হিসেবে পরিচিত পাথারিয়া পাহাড়। ২৫ মাইলজুড়ে সবুজ অরণ্যে ঘেরা দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় এই ঝরনাগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল।

বড়লেখা সদর ইউনিয়নের ডিমাই বাজার থেকে পাথারিয়া পাহাড়ের নির্জন পল্লী ডিমাইপুঞ্জির পাশ দিয়ে দুর্গম পাহাড়ি ছড়ার পথে হেঁটে গেলে চোখে পড়বে কয়েকটি ছোট ঝরনা। ৬ কিলোমিটার পিচ্ছিল পাথুরে ছড়া দিয়ে হাঁটার পর ওপরে উঠলে দুটি টিলার ভেতরে দেখা যাবে ঝেরঝেরি ঝরনা। ঝেরঝেরির ঠিক ডান পাশে রয়েছে ইটাউরি ফুলবাগিচা ঝরনা। ফুলবাগিচায় যেতে হলে প্রায় ৬০-৭০ ফুট উঁচু খাড়া দুটি পাহাড়ের পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে হবে।

পাথারিয়া পাহাড়েরই অন্য প্রান্তে দেশের অন্যতম বৃহৎ জনপ্রিয় জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড। ঝেরঝেরি ও ইটাউরি ফুলবাগিচার মতো পাথারিয়া পাহাড়ের এই অংশ থেকে চোখে পড়বে ত্রিপল ঝরনা, যামিনীকুণ্ড, যমজ ঝরনা, রজনীকুণ্ড, পুছুম ঝরনা, বন্দরডুবা, পাইথুং ও রামাকুণ্ড নামে আরও অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন ঝরনা। এগুলোর বেশিরভাগই মৌসুমি ঝরনা। বর্ষাকালে ঝরনাগুলো যৌবনদীপ্ত থাকে। শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায়। এছাড়াও পাথারিয়া পাহাড়ের ফুলছড়ি নামক স্থানে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নান্দনিক সেতু।

বর্ষাকালে ঝরনা ও ছড়ায় পানি বেশি থাকে। তখন জোঁক, বিষধর সাপ ও পোকা আক্রমণ করতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে এখানে পানির স্রোত কম থাকে। মূলত পাথারিয়া পাহাড়ের চারদিকের সবুজ প্রকৃতি ও শান্ত শীতল ঝরনার দৃশ্য মন কেড়েছে ভ্রমণপিপাসুদের।

কিভাবে যাবেন

মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে পাথারিয়া পাহাড় অবস্থিত। ঢাকা থেকে বাসে এসে বড়লেখার একটু আগে কাঁঠালতলী বাজারে নামতে হবে। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা রিজার্ভ করে পাথারিয়া পাহাড়ে যেতে পারবেন।

ট্রেনে কুলাউড়া স্টেশনে নেমে কাঁঠালতলী হয়ে পাথারিয়া অঞ্চলে যেতে পারবেন। এছাড়া মৌলভীবাজার থেকে বড়লেখায় পৌঁছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা চান্দের গাড়ি নিয়ে ডিমাই হয়েও পাথারিয়া পাহাড় যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

পাথারিয়া পাহাড়ের কাছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যাতায়াতের সুবিধার্থে মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গলে রাতযাপন করাই ভালো।

কোথায় খাবেন

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের কাছে ও বড়লেখা উপজেলায় বেশকিছু রেস্তোরাঁ রয়েছে। এছাড়া সুযোগ করে শ্রীমঙ্গলের নীলকণ্ঠ টি কেবিনের জনপ্রিয় সেভেন লেয়ার চায়ের স্বাদ নিতে ভুলবেন না।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের সীমান্তর্তী ধলই চা-বাগানে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ অবস্থিত। ঝিনাইদহের বীর সন্তান হামিদুর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সিপাহী ছিলেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীমঙ্গল এলাকায় যুদ্ধ করেন। ২৮ অক্টোবর সকালে দলের অধিনায়কের নির্দেশে হামিদুর রহমান ধলই বিওপিতে পাকিস্তানিদের ঘাঁটি দখলের জন্য অগ্রসর হন। হালকা একটি মেশিনগান নিয়ে জীবনবাজি রেখে তিনি একাই দুইটি পাকিস্তানি যুদ্ধ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন। এতে শত্রুঘাঁটির অধিনায়ক এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য নিহত হন।

একপর্যায়ে যুদ্ধরত অবস্থায় এই বীর সন্তান শত্রুদের পাল্টা আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। তার আত্মত্যাগের কয়েক দিনের মধ্যেই ধলই সীমান্ত ফাঁড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সহযোদ্ধারা হামিদুর রহমানের লাশ সীমান্তের ওপারে নিয়ে ভারতের আমবাসা গ্রামের একটি মসজিদের পাশে দাফন করেন।

এই মহান বীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে ধলই চা-বাগানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

প্রতিবছর ২৮ অক্টোবর হামিদুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৌলভীবাজারের স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পর্যটক ও দর্শনার্থী তার এই স্মৃতিসৌধতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

কিভাবে যাবেন

শ্রীমঙ্গল শহর থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা বা বাসে চড়ে কমলগঞ্জ আসতে হবে। সেখান থেকে রিকশায় হামিদুর রহমানের স্মৃতিসৌধে যেতে পারেন।

বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক

মৌলভীবাজার জেলা শহরের উপকণ্ঠে প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণ পাশে পাহাড়ি উঁচু-নিচু টিলা আর দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজির সমারোহ ও দৃষ্টিনন্দন ইট-সুরকির ফটক-প্রাচীরবেষ্টিত বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক। ছোট বড় বেশকিছু টিলাঘেরা চিরহরিৎ পত্রঝরা প্রকৃতির এই বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯১৬ সালে। ২০০৬ সালে বনবিভাগ এই বনের প্রায় ৮৮৭ একর বনাঞ্চল ও আশপাশের এলাকাকে ইকোপার্ক হিসেবে ঘোষণা করে।

নানান গাছপালা আর বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ বর্ষিজোড়া জঙ্গল। বনের প্রধান উদ্ভিদ শাল আর গর্জন। আরও আছে সেগুন, লোহাকাঠ, জারুল, তেলশুর, চিকরাশি ইত্যাদি। এছাড়া আগর, আমলকি, বহেরাসহ নানান ঔষধি গাছও আছে। এখানে বসবাস করে হরেক প্রজাতির জীবজন্তু, সাপ, পাখি। এখানে বসবাস করা জীবজন্তু, পাখির মধ্যে রয়েছে বানর, শূকর, বেজি, কাঠবিড়ালি, মেছোবাঘ, গন্ধগোকুল, ময়না, টিয়া, শালিক, ভিমরাজ, ঘুঘু, ইন্ডিয়ান নাইট হিরণ, প্যাঁচা, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, মেছোপ্যাঁচা, তক্ষক, ঈগল, চিল, বাজপাখি ইত্যাদি।

কিভাবে যাবেন

মৌলভীবাজার শহর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে বর্ষিজোড়া বনাঞ্চল। শহর থেকে অটোরিকশা বা রিকশায় যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

মৌলভীবাজার জেলা শহরে সাধারণ মানের কিছু হোটেল আছে। এসব হোটেলে অল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা আছে। ◆

হাকালুকি হাওড়

বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত হাকালুকি হাওড় একটি মিঠাপানির জলাভূমি। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড়। মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার পাঁচটি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত হলেও এই হাওড়ের প্রায় অর্ধেক পড়েছে বড়লেখা উপজেলায়। হাকালুকি হাওড়ে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের সব মিলিয়ে প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি হাকালুকি হাওড়টি বছরের বিভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। মাছের জন্য প্রসিদ্ধ এই হাওড়ে শীতকালে অতিথি পাখিদের আগমনে মুখরিত হয়ে উঠে। প্রতিবছর শীতের সময় প্রায় ২০০ প্রজাতির বিরল অতিথি পাখি আসে এই হাওড়ে। শীতকালে পাখির কলকাকলিতে নতুন ছন্দ পায় হাকালুকি হাওড়। তা ছাড়া, সারা বছরই দেশীয় প্রায় ১০০ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে।

বর্ষাকালে আবার নতুন রূপ লাভ করে হাকালুকি হাওড়। চারদিকে অথই পানি, তার মধ্যে মাঝিদের নৌকার দৃশ্য হাকালুকিকে দেয় নতুন শোভা। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের শেষের দিকে হাকালুকি হাওড়ের পানি কমতে থাকে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হাকালুকি হাওড়ে পানি শুকিয়ে গেলেই পরি-যায়ী পাখিরা ভিড় জমায়।

অতিথি পাখির মধ্যে বালিহাঁস, ভুতিহাঁস, গিরিয়া হাঁস, ল্যাঞ্জা হাঁস, গুটি ইগল, কাস্তেচড়া, কুড়া ঈগল, সরালি, পানভুলানি, কালিম, টিটি, পেডি উল্লেখযোগ্য। দেশীয় প্রজাতির নানা পাখির মধ্যে রয়েছে- সাদা বক, কানি বক, পানকৌড়ি, চিল, বাজ ইত্যাদি।

হাওড়ে সকালে ও বিকালে পাখিদের উড়াউড়ি বেশি দেখা যায়। হাওড়ের সবখানে পাখিদের খাবার রয়েছে। তাই পাখিরা এক জায়গায় দল না বেঁধে বিচ্ছিন্নভাবে পুরো হাওড়ে অবস্থান করে।

হাওড়ের বিস্তীর্ণ ভূমি, বিলনির্ভর মানুষের জীবনযাত্রা এবং অথিতি দেখতে মানুষ ছুটে চলছে হাকালুকির পানে।

পুরো হাওড় দর্শনের জন্য রয়েছে একাধিক ওয়াচ টাওয়ার। সেসব ওয়াচ টাওয়ারে উঠে হাওড়ের রূপলাবণ্য দর্শন করতে পারেন অনায়াসে। অথবা হাওড়ের বুকে জেগে উঠা জলাবনের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

হাওড় ভ্রমণের সময়

হাকালুকি হাওড় ভ্রমণের উপযুক্ত সময় এপ্রিল-অক্টোবর। তবে অতিথি পাখি দেখতে চাইলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যেতে হবে। এই সময় হাওড়ের চারপাশ অতিথি পাখির কোলাহলে মুখর হয়ে থাকে। আর বর্ষাকালে হাওড় সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। তাই বর্ষাকালে হাওড়ের মজা নিতে চাইলে জুন-আগস্টে আসতে হবে।

কিভাবে যাবেন

সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, মহাখালী থেকে বাসে প্রথমে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া বা বড়লেখায় যেতে হবে। কুলাউড়া, জুড়ি অথবা বড়লেখা থেকে অটোতে করে চলে যেতে পারেন হাকালুকিতে। ট্রেনে করে আসতে চাইলে কমলাপুর কিংবা বিমানবন্দর স্টেশন থেকে সিলেটগামী ট্রেনে চলে আসতে হবে কুলাউড়া রেল স্টেশনে। সেখান থেকে অটোতে করে চলে যেতে পারেন হাওড়ে। তবে হাকালুকি যাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ঢাকা থেকে উপবন এক্সপ্রেসে উঠে নামতে হবে মাইজগাঁও স্টেশনে। এটি সিলেটের ঠিক আগের স্টেশন। মাইজগাঁও থেকে দুটি উপায়ে যাওয়া যায় হাকালুকি।

ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার হয়ে: মাইজগাঁও নামার পর গাছপালা ঘেরা একটা রাস্তা ধরে প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার। আবার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার যাওয়া যায়। বাজারে নেমেই নৌকাঘাটে চলে আসুন। এবার নৌকায় উঠে কুশিয়ারা নদী পাড়ি দিয়ে হাওড়ে ঘুরে বেড়ান। কুশিয়ারা পাড়ি দিতে প্রায় ৪০ মিনিট লাগবে।

গিলাছড়া বাজার হয়ে: কুশিয়ারা নদীর ৪০ মিনিট সেভ করতে মাইজগাঁও থেকে সরাসারি ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে চলে আসতে পারেন গিলাছড়া বাজারে। এখান থেকেই হাওড় শুরু। তবে সমস্যা হলো এখানে বড় নৌকা পাওয়া যায় না। নৌকা আনতে হবে সেই ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার থেকেই।

সিলেট থেকে যাওয়ার উপায়: সিলেট বাসস্টেশন থেকে বাস/মাইক্রোবাস/প্রাইভেটকার/অটোরিকশায় ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সদর যেতে হবে। সময় লাগবে ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা। সেখান থেকে অটোরিকশায় গিলাছড়া জিরো পয়েন্ট যেতে হবে। সদর থেকে দূরত্ব প্রায় ৬ কিলোমিটার।

সিলেট থেকে সরাসরি মাইক্রোবাস/প্রাইভেটকার ভাড়া করেও যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

রাত যাপনের জন্য হাকালুকি ভ্রমণ শেষ করে সিলেটে ফিরে আসাই ভালো। কারণ সেখানে রাতে থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই। মৌলভীবাজার শহরে বেশকিছু ভালো মানের হোটেল আছে। শ্রীমঙ্গল ও নিকটবর্তী উপজেলার আশপাশে বেশ কয়েকটি রিসোর্ট আছে। অবশ্য জলাভূমির ইজারাদারদের কটেজে থাকার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জ জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে অবস্থান করতে পারেন। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার আওতাধীন ভিআইপি সুবিধা সংবলিত রেস্ট হাউস রয়েছে। এছাড়া পার্শবর্তী উপজেলা শহর বড়লেখায় রাত থাকতে পারেন।

হাওড় পাড়ে ক্যাম্পিং

শীতকাল হলে শুকনো বিস্তীর্ণ ভূমিতে তাঁবু বানিয়ে রাত কাটানো যেতে পারে। এই ক্যাম্পিং অভিজ্ঞতা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্যাম্পিংয়ের পাশাপাশি বার বি কিউয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্ষা-শীত দুই ঋতুতেই হাকালুকির নানান জাতের তাজা মাছ ভোজনে তৃপ্তি দেবে। তবে শীতকালে হাকালুকি যাওয়ার আগে ক্যাম্পিংয়ের সরঞ্জাম নিয়ে যেতে হবে।

খাবার-দাবার

খাবারের ক্ষেত্রে চাল-মাছ-মুরগি সাথে নিয়ে গিয়ে এলাকার শ্রমজীবী মানুষকে টাকা দিলে পছন্দমতো রান্না করে দেবে। নৌকায় উঠার আগে কী আনতে হবে সে বিষয়ে মাঝিদের সাথে কথা বলা যেতে পারে। এরপর প্রয়োজন মতো বাজার করে নৌকায় উঠা যেতে পারে। কিছু টাকার বিনিময়ে নৌকার মাঝিই সুন্দর করে রান্না করে দিতে পারেন। নৌকায় উঠার সময় বিশুদ্ধ পানি, বিস্কুট, চিপস, চানাচুর, বাদাম ও পাউরুটির মতো শুকনো খাবার সাথে নিয়ে উঠা উচিৎ। এছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কিছু রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় খাবার পাওয়া যায়।

ভ্রমণে সঙ্গে নিন

ক্যাম্পিং করার জন্য তাঁবু, রেইন কোট, বড় ব্যাকপ্যাক, শীতের সময় গেলে জ্যাকেট, কাদা-পানিতে চলন উপযোগী জুতা, গামছা, বাইনোকুলার, ক্যামেরা, প্রয়োজনীয় ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক, শুকনো খাবার, টর্চ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। ◆

শ্রীমঙ্গল

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী হিসেবে পরিচিত। শ্রীমঙ্গল শহরটা ছোট, তবে বেশ গোছানো। এই শহরের বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ সব স্থাপনার মধ্যেই নান্দনিকতার ছাপ আছে। শহরের বেশির ভাগ জায়গাজুড়েই রয়েছে চা-বাগান। এখানে আপনি যেদিকেই তাকাবেন, দেখবেন চায়ের বাগান, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজের হাতছানি। চা বাগানের সারি সারি টিলা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর ঘন সবুজ অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য। এ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য আর সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে বেড়ানো যায় বারো মাসজুড়েই। তাই ছুটি কাটানোর জন্য বা পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়ানোর জন্য চমৎকার জায়গা হতে পারে শ্রীমঙ্গল। এখানে যেমন বনভূমি রয়েছে; তেমনি রয়েছে হাওড় আর বিল। পাশাপাশি আদিবাসী খাসিয়া, মণিপুরি, গারো, টিপরা-এদের বাড়িঘরও রয়েছে।

শ্রীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, চা জাদুঘর, টি রিসোর্ট, ডিনস্টন সিমেট্রি, চা-কন্যা ভাস্কর্য, নির্মাই শিববাড়ি, চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন, খাসিয়াপুঞ্জি, টিপরা পল্লী, মণিপুরি পাড়া, গারো পল্লী, নীলকণ্ঠ টি কেবিন, বার্নিস টিলা, গলফ কোর্স, পাখি বাড়ি, বাদুর বাড়ি, লালমাটি পাহাড়, রাবার বাগান, আনারস বাগান, মাধবপুর লেক, হাইল হাওড়, বাইক্কা বিল প্রভৃতি।

চা-বাগান

৪৫০ কিলোমিটার আয়তনের শ্রীমঙ্গলকে বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী বলা হয়। এখানকার মাইলের পর মাইল বিস্তৃত চা বাগান দেখে মনে হয় পাহাড়ের ঢালে সবুজ গালিচা বিছানো। দেশের সবচেয়ে উন্নতমানের চা এখানেই উৎপন্ন হয়। এখানকার বেশকিছু চা বাগানের নজরকাড়া সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে চলেছে।

শ্রীমঙ্গলের প্রবেশ পথে 'চা-কন্যা' ভাস্কর্য দৃষ্টি কাড়বে। জেলা প্রশাসনের তৈরি এই ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে সাতগাঁও চা-বাগানের সহায়তায়। এই ভাস্কর্যের সামনে থেকেই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে সাতগাঁও চা-বাগান। এছাড়া পথ চলতে চলতে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে সজীব করবে চা পাতার গন্ধ।

রাস্তার দুই পাশে সারি সারি চা-বাগান যেন সবুজ চাদরে মোড়া কোনো এক স্বপ্নীল ভূমি। যে দিকে যাবেন শুধু সবুজ আর সবুজ। এর পর্যটন স্পটগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কখন যাবেন

সাধারণত মে মাসে চা-পাতা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এ সময় কর্মচঞ্চল চা বাগান সবুজে পরিপূর্ণ থাকে। চা-শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা দেখতে চাইলে মে থেকে অক্টোবরে ঘুরে আসতে পারেন শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন চা বাগান থেকে। এছড়া বছরের যে কোনো সময় ঘুরতে যেতে পারেন চা-বাগানগুলোতে।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

লাউয়াছড়া উদ্যান মৌলভীবাজারের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান। চায়ের শহর শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে শ্রীমঙ্গল-ভানুগাছ (কমলগঞ্জ) সড়কের পশ্চিম পাশে জাতীয় এ উদ্যানের প্রবেশপথ।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এ উদ্যানকে প্রাকৃতিক জাদুঘর বললেও কম হবে। বিভিন্ন প্রকার গাছগাছালি ও পশুপাখি এ বনের শোভা আরও বৃদ্ধি করেছে। সুন্দরবনের পরপরই পর্যটকদের কাছে বেশি জনপ্রিয় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান।

এই বনে রয়েছে ৪৬০ প্রজাতির দুর্লভ বন্যপ্রাণী ও গাছপালা। এর মধ্যে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, চার প্রজাতির উভচর, ছয় প্রজাতির সরীসৃপ, ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২৪৬ প্রজাতির পাখি। এই উদ্যানের অন্যতম আকর্ষণ বিলুপ্তপ্রায় উল্লুক। এছাড়া চশমা বানর, মুখপোড়া হনুমান, লজ্জাবতী বানর, মেছো বাঘ, শিয়াল, মায়া হরিণ ইত্যাদিও দেখা যায় এই বনে। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ঢাকা-সিলেট রেললাইন। এই জায়গাটি দর্শনার্থীদের কাছে খুব প্রিয়।

এছাড়া লাউয়াছড়া যাওয়ার পথে চোখে পড়বে চা-বাগান, উঁচু-নিচু টিলা, আনারস, লিচু ও লেবু বাগান। রাস্তার দুই পাশেই সবুজের ছড়াছড়ি, মনে হবে যেন সবুজের একটি স্বর্গরাজ্য।

উদ্যানে বেড়ানোর তিনটি পথ আছে। একটি তিন ঘণ্টার, একটি এক ঘণ্টার এবং অন্যটি আধ ঘণ্টার পথ। উদ্যানের ভেতরে একটি খাসিয়া পল্লীও আছে।

কিভাবে যাবেন

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ভ্রমণে প্রথমে যেতে হবে চায়ের শহর শ্রীমঙ্গল। সেখান থেকে অটোরিকশা, জিপ কিংবা গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে।

ঢাকার ফকিরাপুল ও সায়দাবাদ থেকে হানিফ, শ্যামলী, সিলেট এক্সপ্রেস, এনা ইত্যাদি পরিবহণের এসি/ নন এসি বাস যায় শ্রীমঙ্গল।

এছাড়া ঢাকার কমলাপুর বা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন হতে থেকে শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশে ছেড়ে যায় আন্তঃনগর ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, কালনী ও উপবন এক্সপ্রেস। চট্টগ্রাম থেকে বাসে বা ট্রেনে শ্রীমঙ্গল যেতে পারবেন। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে শ্রীমঙ্গল যেতে পাহাড়িকা ও উদয়ন এক্সপ্রেস নামে দুটি ট্রেন চলাচল করে। আকাশপথে ভ্রমণ করতে চাইলে ঢাকা থেকে সিলেটে গিয়ে সড়ক পথে শ্রীমঙ্গলে যেতে পারবেন।

টিকিট

উদ্যানে টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হয়। গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে পার্কিংয়ের জন্য টাকা গুনতে হবে। কেউ গাইড নিতে চাইলে এখানে তিন ক্যাটাগরির গাইড পাবেন।

কোথায় থাকবেন

শ্রীমঙ্গলে থাকার জন্যে রয়েছে বেশ কিছু সুন্দর মনোরম রিসোর্ট। আছে চা বাগানঘেঁষা অনেক কটেজ ও সরকারি বেসরকারি গেস্ট হাউস। শ্রীমঙ্গল শহরেও রয়েছে বিভিন্ন মানের হোটেল। আপনার চাহিদা মতো যে কোনো জায়গায় থাকতে পারবেন।

খাওয়ার ব্যবস্থা

উদ্যানের ভেতরে বা আশপাশে খাবারের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে সঙ্গে কিছু হালকা খাবার নিতে পারেন। শ্রীমঙ্গল ফিরে খেতে হবে। সেখানে নানা ধরনের রেস্তোরাঁ আছে।

মনে রাখবেন

- উদ্যানের ভেতর যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না।
- বেশি হৈ চৈ করবেন না।
- বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক চলাফেরা যেন ব্যাহত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ভ্রমণের ক্ষেত্রে জোঁক ও সাপ থেকে সতর্ক থাকুন।
- অপরিচিত কারো সাথে একা বনের গভীরে যাবেন না।

মণিপুরি পল্লী

মৌলভীবাজার শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে শ্রীমঙ্গলের কমলগঞ্জের আদমপুর ইউনিয়নে মণিপুরি সম্প্রদায়ের কাপড়ের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মণিপুরী পল্লী। স্থানীয় মণিপুরিরা এখানে নিজেরা কাপড়ের বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে। দেশ বিদেশে মণিপুরি পণ্য সমূহের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এছাড়া নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কারণেও মণিপুরিদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী।

প্রতিবছর নভেম্বর মাসে অগ্রহায়ণের শুরুতে মণিপুরি পল্লীতে বসে আকর্ষণীয় রাসমেলা। এই মেলায় দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য দর্শনার্থী আসেন। দশনার্থীরা এ সময় কিনতে পারেন মণিপুরি শাল, চাদর, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ব্যাগ, ফতুয়া, পাঞ্জাবি ইত্যাদি। মণিপুরিদের তৈরি করা বিভিন্ন জিনিসের দেশে বিদেশে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। আর এ কারণেই রাসমেলা অথবা মণিপুরি পল্লীতে না যেতে পারলেও এখানকার দোকানেই আপনি এসব মণিপুরি পণ্য পেয়ে যাবেন। মাধবপুরে রয়েছে একটি মণিপুরি সাংস্কৃতিক একাডেমি। পর্যটকদের কাছে শ্রীমঙ্গলের পাহাড়, চা বাগান এবং অরণ্যভূমির নয়নাভিরাম দৃশ্যের পাশাপাশি মণিপুরিদের জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বেশ উপভোগ্য। বিশেষ করে মণিপুরি সম্প্রদায়ের নাচের রয়েছে আলাদা খ্যাতি। এ নাচের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। কোনো পর্যটক পৃথিবীর এই প্রান্তে আসলে তাঁকে অবশ্যই মণিপুরি নৃত্য দেখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

কিভাবে যাবেন

শ্রীমঙ্গল থেকে সুবিধা মতো যেকোনো স্থানীয় যানবাহন ভাড়া নিয়ে আদমপুরের মণিপুরি পল্লীতে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন/ কী খাবেন

রাতযাপনের জন্য শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন মানের অসংখ্য আবাসিক হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে। এসব জায়গাতেই খাবারের সুব্যবস্থা আছে।

চা জাদুঘর

চা বাগানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে টি বোর্ডের উদ্যোগে ২০০৯ সালে শ্রীমঙ্গলে চা রিসোর্ট ও জাদঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের চা শিল্পের প্রায় দেড়শ বছরের প্রাচীন ইতিহাস এবং চা চাষ সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চা গবেষণা কেন্দ্রের কাছে চারটি কক্ষে ৪৪টির অধিক সংগ্রহ ও স্মারকের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এই চা জাদুঘরকে। চা জাদুঘরের পাশে মনোমুগ্ধকর টি-রিসোর্টের অবস্থান।

চোখ জুড়ানো সবুজ চা বাগানে ঘেরা এই জাদুঘরে ব্রিটিশ শাসনামলে চা বাগানে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ব্রিটিশ বাংলোয় ব্যবহৃত শতাধিক আসবাপত্র, চা প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, চা-বাগানের ম্যানেজার ও চা শ্রমিকদের ব্যবহৃত জিনিস, প্রাচীন রৌপ্য ও তাম্য মুদ্রাসহ বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন স্থান পেয়েছে।

চা জাদুঘর প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়।

কিভাবে যাবেন

শ্রীমঙ্গল হতে ইজিবাইক বা অটোরিকশা নিয়ে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চা জাদুঘর।

কোথায় থাকবেন

চা জাদুঘরের পাশেই রয়েছে চা-বাগানঘেঁষা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন টি-রিসোর্ট। অগ্রিম বুকিং দিয়ে এখানে থাকা যায়। এছাড়া কম খরচে রাতযাপনের জন্য শ্রীমঙ্গলে বেশকিছু আবাসিক হোটেল রয়েছে।

কোথায় খাবেন

শ্রীমঙ্গল শহরের বিভিন্ন হোটেল আছে। সেখান খাবার বেশ জনপ্রিয়। তবে রিসোর্টে থাকলে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। আর শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে আসলে অবশ্যই সাত রঙের চায়ের স্বাদ নিতে ভুলবেন না। ◆

হাইল হাওড়

মৌলভীবাজার জেলা সদর, শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত জলাভূমির নাম হাইল হাওড়। ঐতিহ্যবাহী এই হাওর প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব বৈচিত্র্য ও জীবন জীবিকার বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি। হাইল হাওড়ে দেশি-বিদেশি নানা জাতের পাখি, শামুক, ঝিনুক, ফোকল, ঘাস, শাপলা, শালুক, উকল, হিজল-করচ গাছ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল। এই হাওড়ে প্রায় ৯৮ প্রজাতির মাছ ও প্রায় ১৬০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। ১০ হাজার হেক্টরের এই হাওড়ে প্রচুর লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ থাকার কারণে স্থানীয়দের কাছে এটি লতাপাতার হাওড় নামেও পরিচিত।

হাওড়ের চিরায়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নীল আকাশ ও পানির মিতালী যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির বাস্তব রূপ। তাই হাওড়ের বুকে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পর্যটকরা এখানে ছুটে আসেন।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়

বর্ষাকাল হাওড়াঞ্চল ভ্রমণের সবচেয়ে আদর্শ সময়। তবে যদি নানা পজাতির পাখির কলকাকলিতে মুখর হতে চান তাহলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন।

যাওয়ার উপায়

শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার সড়কে অবস্থিত কালাপুর বাজার হয়ে বরুনা-হাজিপুর পাকা রাস্তা ধরে হাজিপুর বাজারে যেতে হবে। স্থানীয়দের কাছে এই বাজারটি ঘাটেরবাজার নামে পরিচিত। ঘাটেরবাজার থেকে যেকোন স্থানীয় যানবাহন কিংবা পায়ে হেঁটে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাইল হাওড়ে যেতে পারবেন।

কোথায় থাকবেন

হাইল হাওড়ের কাছেই শ্রীমঙ্গলের অবস্থান। আর শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন মানের আবাসিক হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে।

মাধবপুর লেক

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সৌন্দর্যের লীলাভূমি মাধবপুর লেক। কমলগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে এই লেকের দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। ১৯৬৫ সালে চা বাগানের টিলায় বাঁধ দিয়ে পানি জমিয়ে এই লেক তৈরি করা হয়। প্রায় ৫০ একর আয়তনের মাধবপুর হ্রদের দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটার।

চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত লেকটি সত্যি অপূর্ব।

ছোট-বড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকাভাবে বয়ে চলেছে লেকটি। লেকের মাঝে ফুটে থাকা হাজারো বেগুনি শাপলার সৌন্দর্য দেখে শুধু মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকতে হয়।

ছবির মতো সুন্দর সারি সারি চা গাছ বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু উঁচু টিলা, গাঢ় সবুজ পাহাড় আর মাথার ওপর সুনীল আকাশ। লেকের স্বচ্ছ নীলাভ জলে আকাশের প্রতিবিম্ব আর ফুটে থাকা অসংখ্য শাপলা-শালুকের অলংকরণ যেন শিল্পীর কল্পনার রঙে আঁকা কোনো নিখুঁত ছবি।

সবুজ পাতার সতেজ গন্ধ আর চা বাগানের মনোরম দৃশ্য প্রকৃতিপ্রেমীদের আনমনে নিয়ে যায় এক ভিন্ন জগতে। মাধবপুর লেকটি যেন প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়া এক নৈসর্গিক সৃষ্টি। শীতকালে এই লেকে অনেক অতিথি পাখির আগমন ঘটে। মাধবপুর লেকে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভ্রমণকারীরা অবস্থানের সুযোগ পান।

কীভাবে যাবেন

শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত মাধবপুর লেক। প্রথমে শ্রীমঙ্গল থেকে বাস অথবা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কমলগঞ্জের ভানুগাছ চৌমোহনা হয়ে মাধবপুর লেক যেতে পারবেন। এছাড়া শ্রীমঙ্গল চা বাগানের কাছ থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া নিয়েও মাধবপুর লেকে যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

শ্রীমঙ্গলে থাকার জন্য ভালো মানের হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে।

এছাড়া আরও কম খরচে চাইলে শহরে নানা মানের হোটেল আছে।

কোথায় খাবেন

এাধবপুর লেকের আশেপাশে খাবারের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

তাই প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে কিছু হালকা খাবার সাথে নিতে পারেন। এছাড়া শ্রীমঙ্গল শহরে ফিরে খেতে হবে। ◆

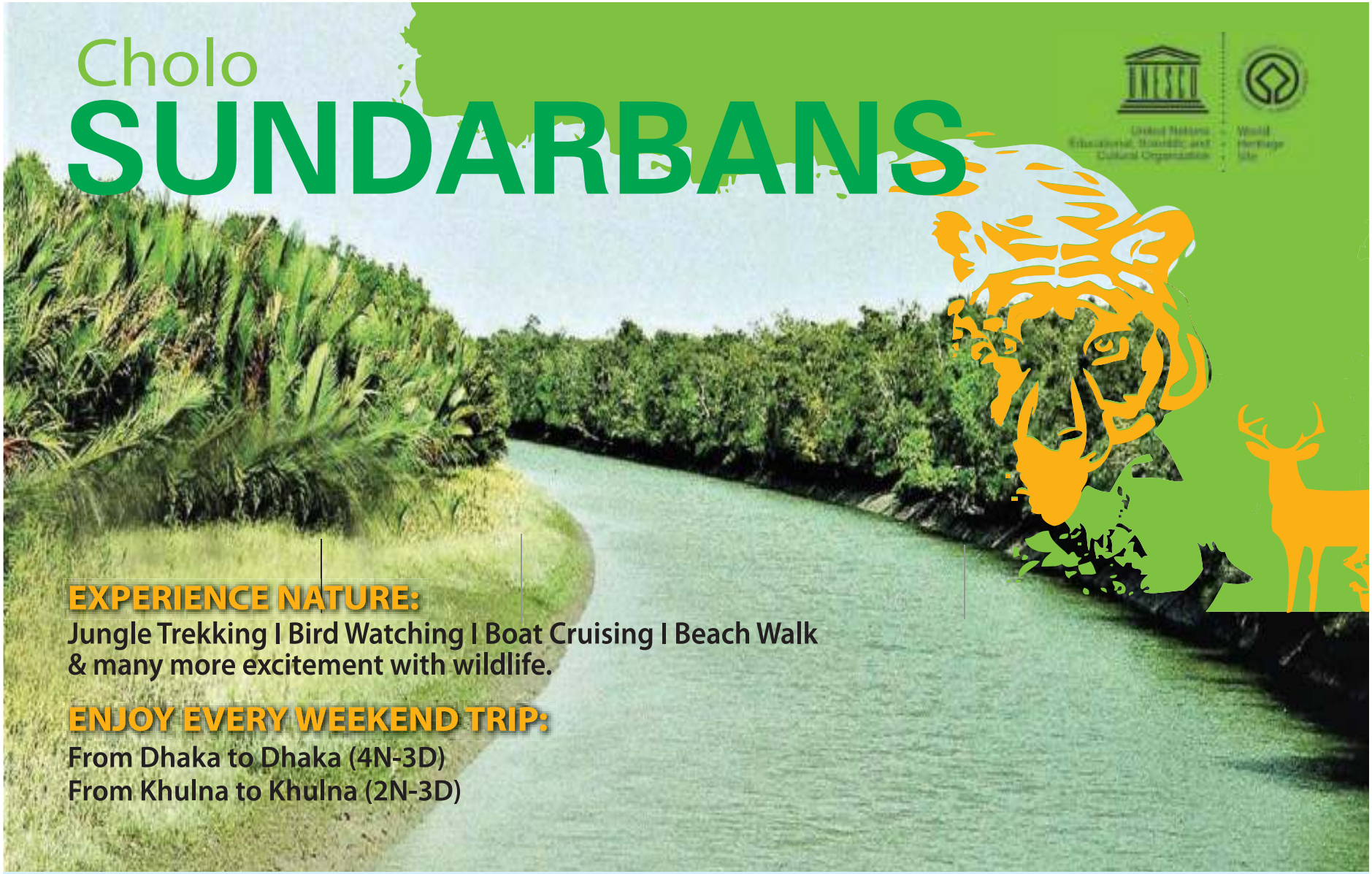

Please contact
for more details

River & Green Tours

RIVER AND GREEN TOURS
House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207. Bangladesh
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com

+88 **01819224593**
+88 **01730450099**

কমিউনিটি ট্যুরিজম

ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রাম

গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল করছে পর্যটন

পাহাড় ঘেরা ও অবিরাম প্রবাহিত নদী বেষ্টিত মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রাম। এখানে মণিপুরি খাবার, সঙ্গীত, নৈপুণ্য এবং শিল্প পরিবেশনা উপভোগের পাশাপাশি এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বস্ত্র বোনার প্রক্রিয়া দেখার অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। সুন্দর চা বাগান ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা পাহাড়ের সীমান্তঘেঁষা কমলগঞ্জ সিলেট বিভাগের অন্যতম সেরা সংরক্ষিত ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। এখানকার প্রধান প্রাকৃতিক আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর চা বাগান, রাবার বাগানের স্থান, ছোট নদী ও স্থানীয় পুকুর। রয়েছে কামারছড়া চা বাগান, মহিমান্বিত হামহাম জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও হরিনারায়ণ দীঘি।

কমলগঞ্জের পর্যটনের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ মণিপুরি সংস্কৃতি। মণিপুরি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা এবং খাবারও ভারতের মণিপুর রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের কাছাকাছি। মণিপুরিদের অধিকাংশই হিন্দু এবং তারা সনাতন ধর্মকে অনুসরণ করে। মণিপুরি সম্প্রদায়ের কিছু অংশ নিজেদেরকে বিষ্ণুপ্রিয়াদশী বলেও ডাকে। বাংলাদেশের মধ্যে মণিপুরি নৃত্য, খাবার ও পোশাক ব্যাপক জনপ্রিয় এবং দেশের পর্যটনের জন্য একটি জনপ্রিয় সম্পদ হয়ে উঠছে।

মণিপুরি রাধা-কৃষ্ণ নৃত্য, মণিপুরি মার্শাল আর্ট পরিবেশনা, কমলগঞ্জের প্রধান উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মার্চ মাসে থাবাল চোনবা নৃত্য; এপ্রিল মাসে লিকন সানাবা উৎসব/নৃত্য; সেপ্টেম্বরে দুর্গাপূজা এবং নভেম্বরের শেষে রাস পূর্ণিমা নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মণিপুরি খাবার এর বিশেষ রেসিপির জন্য খুবই বিখ্যাত। এছাড়া এই সম্প্রদায়ের পোশাক, ঘরবাড়ির ধরন ও স্থাপত্য, কাপড় ও হস্তশিল্প, স্থানীয় স্বর্ণকারের মণিপুরি গয়না তৈরি, কাপড় ও তাঁত বোনা, মণিপুরী বৌদ্ধিক সম্পত্তি জাদুঘর, মণিপুরি সম্প্রদায় কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার, মনিপুরি মন্দির এবং শিব আশ্রম উল্লেখযোগ্য।

কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামে চার বছরেরও বেশি সময় আগে এই গ্রামেরই নিরঞ্জন সিংহের বাড়িতে গড়ে ওঠে কমিউনিটি ট্যুরিজম (সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটন)। শুরুতে ১০টি মণিপুরী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এই গ্রামের ৭৫টি বাড়িতে গড়ে উঠেছে এ ট্যুরিজম।

২০১৮ সালের ৩ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে নিরঞ্জন সিংহের বাড়ি থেকেই শুরু হয় কমিউনিটি ট্যুরিজম। বলা যায় তিনিই উদ্যোক্তা। তার বাড়ির প্রবেশপথে দেয়ালে বড় বড় করে লেখা- 'ভানুবিল মাঝেরগাঁও মণিপুরি কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম'।

এই গ্রামের বাড়িগুলোর প্রতিটি ঘরের একটা অংশ পর্যটকদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো বাড়ির দুটি, কোনো বাড়িতে চারটি কক্ষেই পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে তাঁত আছে। আছে নিজেদের ঐতিহ্য প্রদর্শনের তাক।

পেছনের গল্প

নিরঞ্জনের প্রয়াত ভগ্নিপতি রবিনের মণিপুরি তাঁতবস্ত্রের কারখানা ছিল। জাপানে তাঁতবস্ত্র রপ্তানি করতেন তিনি। জাপানি ক্রেতারা সরাসরি পণ্য তৈরির কাজ দেখতে চাইতেন। রবিন তাদের ভানু-বিল মাঝেরগাঁওয়ে আনতেন। নিরঞ্জন সিংহ মণিপুরিদের জীবনযাপন, তাঁতবস্ত্র বোনাসহ এলাকার পর্যটনস্থানগুলো তাদের ঘুরিয়ে দেখাতেন।

রবিন মারা যাওয়ার পর ভানুবিলে জাপানিদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সাল তখন। এরপর নিরঞ্জন সাধারণ পর্যটকদের বাড়িতে রেখে তিনি নিজেদের ঐতিহ্য জানানোর ব্যবস্থা করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

আর তখনই পর্যটন ব্যবসায়ী আজিয়ার কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমের প্রবক্তা শাহিদ হোসেন শামীম এগিয়ে আসেন। তিনি অনেককে নিরঞ্জনের বাড়িতে আনতেন। মণিপুরিদের আপ্যায়নে পর্যটকরা মুগ্ধতার কথা বলতেন। শামীম বিষয়টি তৎকালীন সিলেট বিভাগীয় কমিশনারকে জানালে তিনি বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। 'সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটনের মাধমে কর্মসংস্থান' নামের এই প্রশিক্ষণের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের বাড়িগুলো পর্যটকদের থাকার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণ নেওয়া ব্যক্তিদের শেখানো হয়- বাড়িঘর গোছানো, রান্নাবান্না, স্বাস্থ্যবিধি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, ভ্রমণের সূচি তৈরি এবং পর্যটন গাইডের দায়িত্ব। স্থানীয়ভাবে এই পর্যটন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কমিটি করে দেওয়া হয়। কমিটির কাজ তত্ত্বাবধান করেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান। কোনো পর্যটক এলে এই কমিটির মাধ্যমেই তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করা হয়। পাশাপাশি পর্যটন থেকে আসা আয় বন্টনসহ অন্যান্য কাজও কমিটির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

এভাবে এই গ্রামে শুরু হয় কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম। প্রথমে ১০টি মণিপুরি পরিবার যুক্ত হলেও এখন আছে ৭৫টি পরিবার।

এর আগে টাঙ্গাইলে এ ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে আজিয়ার ফেয়ার ট্রেড লিমিটেড। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কমলগঞ্জে এই প্রকল্প হাতে নেয় প্রতিষ্ঠানটি। প্রকল্পের লক্ষ্য দুটি। স্থানীয় মানুষকে স্বাবলম্বী করা এবং পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো। মণিপুরি সম্পদায়ের নারীরা পুরুষের মতো তৎপর। প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উপার্জনের পথ খুলেছে। এই গ্রামের বাসিন্দারা এখন বাড়িতে পর্যটন সেবা দিয়ে উপার্জন করছেন। শীত মৌসুমে এটা আরও বাড়বে।

দেশে কমিউনিট ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়নে আজিয়ার ফেয়ার ট্রেড লিমিটেড ২০০২ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যটন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় কমলগঞ্জের ভানুবিল

মাঝেরগাঁওয়ে এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এখানে পর্যটকদের প্রয়োজেন স্বল্পকারে মণিপুরি সংস্কৃতি তুলে ধরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজনও করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিটি কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম পরিবারে রয়েছে মণিপুরি তাঁতবস্ত্র, তাঁতবস্ত্র তৈরির প্রদর্শনীসহ মণিপুরি ছোটখাটো আরও অনেক কিছু।

দেশি-বিদেশি পর্যটকরা এখানকার বাড়িগুলোতে পারিবারিকভাবে অবস্থান করে একে অন্যের খাবার, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, আচর-আচরণ, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছেন। গত দুই বছর করোনাকালীন কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম অনেকটা থমকে গেলেও চলতি বছর থেকে আবারও পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় চলে এসেছে মণিপুরি কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজম।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বর্তমানে দেশি পর্যটকদের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকরাও এখানে আসতে শুরু করেছেন। বিদেশিদের আগমনের ফলে দেশের বৈদেশিক আয় বাড়ছে। তবে কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমে মণিপুরিদের সীমিত আবাসস্থলে অতিরিক্ত পর্যটকের চাপ থাকলে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই ট্যুরিজম আরও সম্প্রসারণ করলে দেশের পর্যটন এগিয়ে যাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

পর্যটকদের ব্যয়

একটা কক্ষে দুটি করে বিছানা। প্রতিটি কক্ষের ভাড়া দুই হাজার টাকা। চারজনের থাকার ব্যবস্থা আছে। কেউ চাইলে একাও থাকতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ভাড়া পড়বে এক হাজার টাকা। পরিবারগুলোর সঙ্গে সকালের নাশতাসহ তিন বেলা খাবারের খরচ জনপ্রতি ৯০০ টাকা। আগে ৭০০ টাকা ছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে বাড়ানো হয়েছে। এই ট্যুরিজমে একেবারে ভিন্ন পরিবেশে পর্যটকদের মুড়ির মোয়ার সাথে হারবাল চা পরিবেশন করা হয়। খাবারে নিজেদের উৎপাদিত বিষমুক্ত শাকসবজি ব্যবহার করা হয়।

নিরাপত্তা

কমিউনিটি বেজড ট্যুরিজমে প্রশাসনিক সহায়তার সঙ্গে পর্যটন পুলিশেরও নজরদারি রয়েছে। এখানে অহেতুক কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। মণিপুরি পরিবারের নারীরা বাড়িতে পর্যটকদের সেবাযত্ন ও রান্নার কাজ করেন এবং পুরুষ সদস্যরা হাটবাজার করার সঙ্গে পর্যটকের পছন্দের মাধবপুর লেক, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, হামহাম জলপ্রপাত এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে ব্যবস্থা করা ছাড়াও গাইড হিসেবে সাথে থাকেন।

কিভাবে যাবেন

দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে আন্তঃনগর ট্রেনে কমলগঞ্জের ভানুগাছ কিংবা শমসেরনগর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে প্রাইভেটকার অথবা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে আদমপুরের ভানুবিল গ্রামে যাওয়া যায়। সড়কপথেও সহজে ভানুবিল গ্রামে যাতায়াত করা যায়। কমলগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরত্ব ভানুবিল গ্রামের। এছাড়া শ্রীমঙ্গল বা মৌলভীবাজার থেকেও সহজে স্থানীয় পরিবহণে যাতায়াত করা যায়। ◆

মণিপুরি সম্প্রদায়ের রাস উৎসব

মেলা উৎসব

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ- বৃহত্তর সিলেট। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এক অনন্য ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে মণিপুরি সম্প্রদায়। মণিপুরিরা এই দেশের অন্যতম বিশ্বনন্দিত সংস্কৃতির ধারক। তাদের মধ্যে এক বিশাল সংখ্যক লোক হচ্ছে সনাতন ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মাবলম্বী মণিপুরিদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব 'মহারাসলীলা'। প্রতিবছর কার্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়ণের শুরুতে রাসপূর্ণিমা তিথিতে মনিপুরি সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করে।

মৌলভীবাজার জেলার সীমান্তর্তী দুই উপজেলা কমলগঞ্জ আর আদমপুরে পালিত হয় এই উৎসব। পূর্ণিমার দিন সকালে পাপমোচন ও পূণ্য লাভের আশায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দলে দলে পূজা-অর্চনা পাঠ ও পুণ্যস্নান করেন।

রাসমেলা মণিপুরিদের প্রধান উৎসব। এটি রাসলীলা নামেও পরিচিত। এই মেলার ইতিহাসও দীর্ঘকালের। সুন্দরবনের দুবলারচর ও কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকতেও এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। চলতি মাসের ৮ তারিখ কমলগঞ্জ ও আদমপুরে এবারের মহারাসলীলা উৎসব শুরু হয়। কমলগঞ্জের মাধবপুরের জোড়ামণ্ডপে রাসলীলা উৎসবের আয়োজন করেন মহারাসলীলা সেবা সংঘের বিষ্ণু-প্রিয়া মণিপুরিরা। আর আদমপুরের তেতইগাঁও সানাঠাকুর মণ্ডপে রাসলীলা উৎসবের আয়োজক মৈ-তৈ সম্প্রদায়ের রাস উৎসব উদযাপন কমিটি। মাধবপুর জোড়ামণ্ডপের ১৮০তম ও তেতইগাঁও সানাঠাকুর মণ্ডপ প্রাঙ্গণের ৩৭তম রাস উৎসব এটি। মহারাসলীলা উপলক্ষে নভেম্বরের শুরু থেকেই এই দুটি মণ্ডপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সাজানোর কাজ শুরু হয়।

সাদা কাগজের নকশায় নিপুণ কারুকাজে সজ্জিত করা হয় মণ্ডপগুলো। ৮ নভেম্বর বেলা ১১টা থেকে তুমুল হৈ চৈ, আনন্দ-উল্লাসে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল, শঙ্খ ধ্বনির আর বাতাসা বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে রাখাল নৃত্য (গোষ্ঠলীলা) শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। খোলা মাঠে কলাগাছ ও সাদা কাগজ দিয়ে ঘেরা সামিয়ানা টানানো প্যান্ডেলে নৃত্য চলাকালীন ভক্তরা মণ্ডপে বাতাসা ছিঠিয়ে বাতাসা বৃষ্টি করেন। সেই বাতাসা আবার ভক্তরা কুড়িয়ে নেন। মণ্ডপে মণিপুরি শিশু নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যাভিনয় রাতভর মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের। মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও মেতে উঠে এই আনন্দে। রাতে অনুষ্ঠিত হয় রাস উৎসব। এ উপলক্ষে রাতে লাখো মানুষের মিলনতীর্থে পরিণত হয় মাধবপুর জোড়ামণ্ডপ আর আদমপুরের সানাঠাকুর মণ্ডপ এলাকা।

এ বছর অসংখ্য বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে মণ্ডপ দুটিতে। মহারাত্রির আনন্দের পরশ পেতে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরসহ নানা পেশার মানুষের পদচারণায় সকাল থেকে মুখরিত হয়ে উঠে মণিপরি পল্লীর এ দুটি এলাকা। উৎসবকে কেন্দ্র করে দুটি স্থানেই বসে বিশাল মেলা। মেলায় নানা ধরনের পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা।

মাধবপুর ও আদমপুরে রাসমেলার আয়োজকরা জানিয়েছেন, মহারাসলীলা মূল উপস্থাপনা শুরু হয়েছে বেলা ১১টা থেকে 'গোষ্ঠলীলা বা রাখাল নৃত্য' দিয়ে। গোষ্ঠলীলায় রাখাল সাজে কৃষ্ণের বালকবেলাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে কৃষ্ণের সখ্য ও বাৎসল্য রসের বিবরণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গোধূলি পর্যন্ত চলে রাখাল নৃত্য। রাত ১১টা থেকে পরিবেশিত হয় মধুর রসের নৃত্য বা শ্রী শ্রী কৃষ্ণের মহারাসলীলানুসরণ। রাসনৃত্য ভোর পর্যন্ত চলে। রাসনৃত্যে গোপিনীদের সাথে কৃষ্ণের মধুর-লীলার কথা, গানে ও সুরে ফুটিয়ে তুলেন শিল্পীরা। রাসলীলার ইতিহাস প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। জানা যায় ১৭৬৯ সালে মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশে রাসলীলার এই নৃত্য-গীতের প্রর্বতন করেছিলেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র বেষ্ণব ধর্মের আচরণীয় শ্রীমদ্ভগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় পঠন সেবায় ব্রতী হন বটে কিন্তু ভগবৎকৃত রাসলীলা, গোপী, সখী ও মঞ্জুরীসহ বিরাজমান দৃশ্য চাক্ষুষ দর্শনে অপারগ হয়ে নিজে শ্রীগোবিন্দ জিউর চরণে প্রাণপাত শয়নে গেলেন। তন্দ্রাবস্থায় তিনি দেখতে পান, শ্রীকৃষ্ণ শীর-াধা ও গোপীসহ দিব্য রাসলীলা করছেন। এরপর মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র কয়েকজন কুমারী মেয়ে দিয়ে স্বপ্নের মতো রাসলীলা করালেন। এতে নিজ কন্যা কুমারী বিশ্বাবতীকে শ্রীরাধা এবং মন্দিরের শ্রীগোবিন্দকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে রাসলীলা করেন।

কিভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে সরাসরি কমলগঞ্জ যাওয়া যায় ট্রেনে। সিলেটগামী পারাবত ও জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) স্টেশনে থামে। এছাড়া অন্যান্য ট্রেনে শ্রীমঙ্গল এসেও সেখান থেকে সহজেই কমলগঞ্জ আসা যায়। ঢাকার কমলাপুর থেকে ছেড়ে যায় আন্তঃনগর ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ও উপবন এক্সপ্রেস।

এছাড়া ঢাকার ফকিরাপুল ও সায়দাবাদ থেকে হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহণ, সিলেট এক্সপ্রেস ইত্যাদি পরিবহণের এসি/নন এসি বাস যায় শ্রীমঙ্গল। শ্রীমঙ্গল থেকে কমলগঞ্জ যাওয়া যায় বাস কিংবা অটোরিকশায়। একইভাবে যাওয়া যাবে আদমপুরেও।

কোথায় থাকবেন

কমলগঞ্জে থাকার তেমন কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। কাছাকাছি থাকার জন্য ব্যবস্থা হল লাউয়াছড়া বনের পাশে বেসরকারি বাংলো। এছাড়া কমলগঞ্জের কাছাকাছি থাকার জন্য রিসোর্ট আছে। ◆

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবার

বাংলাদেশের একেক অঞ্চলে আছে বিশেষ বিশেষ খাবার, যে খাবারগুলোর সঙ্গে এক হয়ে গেছে সেই অঞ্চলের নাম। বৃহত্তর সিলেটেও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাবার আছে। এসব খাবার ভীষণ জনপ্রিয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- সাতকরা দিয়ে তৈরি মাংস, চুঙ্গাপিঠা, হিদলের শিরা ও ভর্তা, আখনী, সাত রঙা চা ইত্যাদি।

স্থানীয় খাবার

সাতকরা

অঞ্চলভিত্তিক রান্নায় সিলেটের সাতকরা (হাতকরা) অন্যতম। মাছ-মাংসের তরকারিতেও এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া রয়েছে সাতকরার খাট্টা বা টক। সাতকরা দিয়ে তৈরি মাংসের বিভিন্ন পদের জন্য সিলেট বেশ বিখ্যাত। তবে সিলেটের রসনাবিলাসের শীর্ষে আছে সাতকরা দিয়ে রান্না করা গরুর মাংস ভুনা। সাতকরা দিয়ে রান্না করা গরুর মাংস কেবল সিলেটে নয়, সিলেটের বাইরেও সমান জনপ্রিয়। সাতকরা দিয়ে গরুর মাংসের কথা শুনলে অনেকেরই জিভে জল চলে আসে।

সাতকরা একটি লেবু জাতীয় ফল। টক-মিষ্টি স্বাদের ফলটি ঘ্রাণেও অনন্য। সাতকরায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। শুধু গরুর মাংসই নয়, বড়মাছ দিয়েও সাতকরা রান্না করা হয়। সিলেটের বেশির ভাগ হোটেল-রেস্তোরাঁয় সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস পাওয়া যায়। এছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি ও ব্যবসার জন্য বসবাসরত সিলেটিরা কাঁচা অথবা রোদে শুকিয়ে সাতকরা নিয়ে যান প্রবাসে। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাতকরা চাষ হচ্ছে। জনশ্রুতি আছে, সাতকরার জন্ম ভারতের আসামে। সেখান থেকে সিলেটে প্রবেশ এবং স্থানীয়দের খাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে বহু আগেই।

চুঙ্গাপিঠা

প্রাচীন ঐতিহ্য সিলেটের পিঠে-পুলির অন্যতম চুঙ্গাপিঠা বা চুঙ্গাপুড়া। খড়ের আগুনে বাঁশের ভেতর আতপ চালের গুঁড়ি সেদ্ধ হয়ে তৈরি হয় লম্বাটে সাদা পিঠা। চুঙ্গার ভেতরে তৈরি বলে এর নাম চুঙ্গাপিঠা। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে শীত মৌসুমে ভাপা, পুলি আর মালপোয়া পিঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পিঠা উৎসব মাতালেও এর দেখা পাওয়া এখন দুষ্কর।

এক সময় বাড়িতে জামাই এলে এই চুঙ্গাপিঠার সঙ্গে হালকা মসলায় ভাজা মাছ, নারকেল, কুমড়ার মিঠা বা রিসা পরিবেশন করা ছিল রেওয়াজ। রাতভর চলত চুঙ্গাপুড়ার কাজ। গিট্টু (ভাঁজ) মেপে ছোট ছোট করে কাটা বাঁশের ওপর জ্বলত খড়ের আগুন। কালের পরিক্রমায় সেই পিঠা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। পৌষ ও মাঘের শীতের রাতে বৃহত্তর সিলেটের গ্রামে গ্রামে চুঙ্গাপিঠা তৈরির ধুম পড়ে। আগে চুঙ্গাপিঠা তৈরির সময় সঙ্গে থাকত গান, পুথিপাঠ, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুকসহ বিভিন্ন

সাতকরায় গরুর মাংস ভুনা রেসিপি

সিলেটে প্রায় সব প্রকার মাংস রান্নাতেই সাতকরা ব্যবহার করা হয়। তবে সঠিকভাবে রান্না করতে না জানলে এর আসল স্বাদ পাওয়া যাবে না। আসুন জেনে নিই- সাতকরায় গরুর মাংস ভুনার রেসিপি।

উপকরণ: হাড়সহ ১ কেজি গরুর মাংসের সাথে মাঝারি আকারের একটি সাতকরার চার ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করা জুতসই হবে। সাতকরা কেটে ভেতরে বুকের অংশ বাদ দিয়ে মাংসের আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে টুকরা টুকরা করতে হবে। পেঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ, পেঁয়াজবাটা ১ কাপ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, আদা আধা টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ও জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া দেড় চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ ও তেল-লবণ পরিমাণ মতো।

প্রণালি: মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার মাংসে মসলা মিশিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ হলে নামিয়ে অন্য এক পাত্রে তেল গরম কওে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভাজতে হবে। সঙ্গে বাটা পেঁয়াজও কষাতে হবে। কষানো মসলায় সেদ্ধ করা মাংস ঢেলে প্রায় ১০ মিনিট অল্প আঁচে ভুনতে হবে। ভুনা হলে পরে টুকরা সাতকরা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিতে হবে। এতে সাতকরা সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে রান্না শেষ।

মনে রাখবেন, রান্নার আগে সাতকরা সেদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। সেদ্ধ করলে এর স্বাদ আর ঘ্রাণ থাকে না। আকারে গোল আর হালকা ওজনের সাতকরা সবচেয়ে সুস্বাদু।

পরিবেশনা। এখন এসব পরিবেশনা না থাকলেও রয়েছে শীতের রাতে খড়ের আগুনে চুঙ্গাপিঠা তৈরির প্রচলন।

ঐতিহ্যবাহী এই পিঠা বানাতে ঢলু নামে যে বিশেষ প্রজাতির বাঁশ দরকার হয়, তা বিলুপ্ত হতে বসেছে। নির্বিচারে বৃক্ষনিধন আর পাহাড় উজাড়ের কারণে ঢলু বাঁশ এখন সহজে পাওয়াই মুশকিল। শীতকালে কালেভদ্রে দেখা মেলে ঢলু বাঁশের। এ বাঁশে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে বলে সহজে আগুনে পোড়ে না। ক্রমাগত তৈলাক্ত তরল নিঃসরণ করে টিকে থাকে সরু বাঁশের সবুজ শরীর। এমনকি কয়েক ঘণ্টা আগুনে পোড়ার পরও সবুজই থাকে ঢলু বাঁশ। কিন্তু আগুনের ভাপে চোঙ্গার ভেতরে ঠিকই তৈরি হয়ে যায় চুঙ্গাপিঠা।

সাত রঙের চা

এটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বিখ্যাত চা। দেশজুড়ে রয়েছে সাত রঙা চায়ের খ্যাতি। বিখ্যাত চায়ের দোকান 'নীলকণ্ঠ টি কেবিনে' এই চা পাওয়া যায়। সিলেটে এই চা-কে 'রেইনবো টি' বলা হয়। এই চায়ের উদ্ভাবক স্থানীয় রমেশ রাম গৌড়। এই চায়ের রয়েছে অন্য রকম স্বাদ, যা সাধারণ চায়ের মতো না। এক কাপে সাত রঙের চা; এ যেন আকাশের রংধনুর মতোই বর্ণিল, এক এক স্তরে থাকে আলাদা আলাদা স্বাদ। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, একটি স্তর অপরটির সাথে মেশে না। চা-প্রেমীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসেন সাত রঙা চায়ের স্বাদ নিতে। শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে এই চা পান করেননি, এমন মানুষ খুব কম রয়েছে। মানুষ শখের বসে এই চা পান করে থাকেন। অনেকে শুধুমাত্র এখানে আসেন সাত রঙের চায়ের স্বাদ নিতে।

এই চায়ের কিছু বিশেষ উপকরণ রয়েছে। সেগুলো হলো তিন ধরনের চা পাতা, দারুচিনি, ঘনীভূত দুধ, লেবু এবং লবঙ্গ। মিষ্টি স্বাদ থেকে শুরু করে ঝাঁঝালো লবঙ্গসহ সাতটি স্তরে থাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ। ওপরের স্তরটি দারুচিনি এবং নিচের স্তরটি লেবুর স্বাদ। এর পরের স্তরগুলোতে ঘনীভূত দুধের সাথে কালো চা থাকে এবং নিচের স্তরগুলোতে মিষ্টি, লবঙ্গসহ শরবত সবুজ চা এবং বিভিন্ন ধরনের মসলা থাকে।

আখনি

সিলেট অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় প্রচলিত খাবার আখনি। চাল, ঘি, গরম মশলা, সবজি এবং মাংস মিশিয়ে রান্না করা এই খাবারটি একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে সুপরিচিত।

চাল দিয়ে তৈরি এই খাবারটির উৎপত্তি হয় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মাধ্যমে। এটি প্রায়ই বিরিয়ানি বা পোলাওয়ের একটি বিশেষ প্রকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফলে এটিকে আখনি বিরিয়ানি এবং আখনি পোলাও নামে ডাকা হয়। এই খাদ্যের পদটি বাংলাদেশজুড়ে, একই সাথে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও জনপ্রিয়। এছাড়া হিদলের শিরা ও ভর্তা খুব জনপ্রিয় সিলেটে। হিদল বা সিদল এক জাতের মাছের শুটকি। এই শুটকি সিলেটিরা বিভিন্নভাবে রান্না করে থাকে। এর মধ্যে শিরা ও ভর্তা অন্যতম। ◆

অপরূপ বাংলার অনন্য সৌন্দর্য দর্শনে বেরিয়ে পড়ুন এখনই-
আপনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনার অপেক্ষায়
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
রূপময় বাংলাদেশ
।।বিদেশ ভ্রমণ করার আগে নিজের দেশ ভ্রমণ করুন।।
।।দেশকে জানুন, পর্যটনের আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।।
আপনার নিরাপদ আবাসন এবং সুস্বাদু খাবারের নিশ্চয়তা
visit Bangladesh
পর্যটন মোটেল, রাজশাহী
পর্যটন মোটেল, রংপুর
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
GOVT. TOURISM ORGANIZATION | www.parjatan.gov.bd

Desert express

www.desertexpress.ae.com

TRAVEL WITH US UAE

BOOK YOUR TRAVEL NOW

Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition

Sightseeing | Transport

Corporate Event

Corporate Training | Documentary | Guide & logistics

Education / Medical / Migration Consultancy

BANGLADESH House: 97/1, Flat: 2B, Sukrabad, Dhaka-1207 +880 1708 427788, +880 1730 450099 desertexpress20@gmail.com

আমিই রামনাথ

■ **আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল**

রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন বিস্ময়কর ভূ-পর্যটক, বিপ্লবী ও মানবদরদি। ১৮৯৪ সালের ১৩ জানুয়ারি হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে তার জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে বাঙালি পল্টনের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যান। ১৯২৪-এর পল্টন ছেড়ে মালয়ে কাজ নেন। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে ৩৫ বছর বয়সে তার বিশ্ব পরিক্রমা শুরু করেন বাইসাইকেলে। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরেছেন। সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন। সাইকেলে চারটি মহাদেশ ঘুরেছেন।

শঙ্খ মহারাজের ৫০টির অধিক ভ্রমণবিষয়ক বই রয়েছে। তার পরই রয়েছে রামনাথ বিশ্বাসের। তার ৩০টি ভ্রমণবিষয়ক বই রয়েছে। ভ্রমণ ছাড়াও রামনাথ বিশ্বাস গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। ভ্রমণ লেখা শেষ করার পর প্রকাশকের অভাবে পরবর্তীতে নিজেই প্রকাশক হয়ে যান। নিজের প্রকাশনী থেকে বই বের করেন।

দুই চাকায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো ভোলেননি তিনি সুজলা সুফলা বাংলা মায়ের সন্তান। বরং এটাই তার একমাত্র অহংকার ছিল। তার প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তার মধ্যে একটা ঝলসে ওঠা তেজস্বী মনুষ্যত্বের ছাপ পাওয়া যায়। মাথা উঁচু করে আত্মপরিচয় দিতেন। 'আমি বাঙালি প্রথম। বাংলা ভাষা যারা বলে তারাই আমার ভাই। তারপর ইন্ডিয়ান'। তার গানের ছন্দে যে লাইন কটি নাচানাচি করত। 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি'।

নাম জাহির করলে পর্যটন হয় না, হয় আরাম ও বিরাম। কি অবলীলায় তিনি এমন ভবিষদ্বাণী করেছিলেন তা টের পাই হাল-জামানার ফেসবুক ও মিডিয়া ভ্রমণ সেলিব্রেটিদের দেখলে। নিজে কয়টি দেশ ঘুরলেন, পতাকা নিয়ে কী করলেন তারই আস্ফালন। কবি আবু হাসান শাহরিয়ার তাই তো আগেই বলেছেন- 'আকাশে পাখি নেই, মশারাই আজ খ্যাতির শীর্ষে'।

লক্ষাধিক সাইক্লিস্ট রয়েছে দেশে। সংগঠনেরও অভাব নেই। কিন্তু রামনাথ নিয়ে তার ভ্রমণবিষয়ক বই বা বাংলা ভাষায় ভ্রমণ বই নিয়ে তাদের অগ্রাহ তলানিতে। নিজের নাম ও খ্যাতির পেছনে ছুটছেন। অন্যকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সময় কোথায়। যে জাতি জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান দেয় না, সেখানে জ্ঞানী ও গুণী মানুষ জন্ম নেয় না।

বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র বাংলাদেশি লেখকদের ভ্রমণবিষয়ক বই রয়েছে চৌদ্দশ'র মতো। একমাত্র সেজান মাহমুদ ১৯৯২/৯৩ সালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০ অভিযাত্রী বইতে রামনাথ বিশ্বাসের কথা লিখেছেন এবং পরবর্তীতে এই লেখকের সাথে যখন শ্যামসুন্দর বসুর দেখা হয়, তখন তিনি লেখককে 'রামনাথের পৃথিবী' বইটি উপহার দেন। শ্যামসুন্দর বসু ১২ বছর গবেষণা করে 'রামনাথের পৃথিবী' বইটি লিখেছেন। আমরা সবাই কৃতজ্ঞ শ্যামসুন্দর বসুর প্রতি এবং কৃতজ্ঞ নিত্য উপহারের। বাহার রহমান ভাই আমার অনুরোধে রামনাথ বিশ্বাসের ওপর দুটি টি-শার্ট বের করেন।

কলকাতায় রামনাথ বিশ্বাসের নামে সড়ক রয়েছে 'রামনাথ বিশ্বাস লেন'। মুম্বাইতে রামনাথের নামে পুরস্কার দেয়া হয়। অথচ নিজ দেশেই তার বসতভিটা বেদখল হয়ে আছে। সাংবাদিক রাজিব নূরসহ আরও কয়েকজন সাংবাদিক রামনাথের বসতভিটায় গিয়ে দখলদারদের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। এটা অন্যায়, মেনে নেওয়া যায় না। শুধু রামনাথ বিশ্বাসই নয়, সারা দেশে কত শত মানুষের ভূমি বেদখল হয়ে আছে তার হিসাব কি আমরা রাখি। মানুষ তুমি কথা বল, মানুষ তুমি প্রতিবাদ কর-এসব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তবেই তোমার জন্ম সার্থক।

রামনাথ বিশ্বাস, সৈয়দ মুজতবা আলীর চেয়ে বছর দশেকের বড় ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের লেখায় কখনো রামনাথ বিশ্বাসের কথা এসেছে কিনা জানা নেই। সৈয়দ মুজতবা আলীর ওপর আমার জানামতে মাত্র চারজন পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। একজন বাংলাদেশের আর বাকি তিনজন পশ্চিমবঙ্গের। বর্তমানে অনেকে পিএইচডি করার চেষ্টায় রয়েছেন। তবে রামনাথ বিশ্বাসের ওপর এখনো কেউ পিএইচডি করেননি। গবেষকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি- রামনাথ বিশ্বাসের ওপর পিএইচডি করার জন্য। বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন ভ্রমণের ওপর দুটি পদক দেবে ২০২২-২০২৩ সালে। এর মধ্যে একটি সৈয়দ মুজতবা আলী ও অপরটি রামনাথ বিশ্বাসের নামে।

আমরা বিদেশ ভ্রমণে গেলে সেই দেশের বিখ্যাত লোকদের বাড়ি/জাদুঘর পরিদর্শন করি। আমাদের দেশেও অনেক আন্তর্জাতিক মানের বিখ্যাত মানুষ রয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- এফআর খান, ব্রজেন দাস, অতীশ দীপঙ্কর, রামনাথ বিশ্বাস, সৈয়দ মুজতবা আলী, শ্রী চিন্ময়, আবেদ খান প্রমুখ। এদের নামে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই। দেশে এত এত পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল। অথচ এদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিবসে মিডিয়ায় প্রচার প্রসারের দায়িত্ব নিতে পারি না। গেল ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ছিল। এমন একটি সুন্দর দিনে ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বসতভিটা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ কমিটি বাইসাইকেল শোভাযাত্রা আয়োজন করেছিল। ওইদিন বেলা ১১টা হবিগঞ্জের টাউন হল থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। আমাদের সাথে যোগ দেন দেশের বিভিন্ন সাইক্লিং সংগঠন, সাইক্লিস্ট, সাহিত্যিক, সমাজসেবক, সাংবাদিক তথা রামনাথ বিশ্বাসের ভক্তকুল। ঢাকায় সম্প্রতি সাইকেল লেন চালু হয়েছে; সেটির নামকরণ রামনাথ বিশ্বাসের নামে হতে পারে। রামনাথ বিশ্বাসের জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সাইক্লিস্ট সংগঠন আয়োজন করতে পারে জনসচেতনমূলক সাইক্লিং র‍্যালি।

বাংলাদেশ থেকে তিনটি বড় কোম্পানি সাইকেল রপ্তানি করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম এবং সারা বিশ্বে অষ্টম বৃহত্তম সাইকেল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম রয়েছে। এসব কোম্পানি পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

লেখক: ভূ-পর্যটক আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন। ◆

ভ্রমণ গল্প

দ্বিচক্রযানে রেমা-কালেঙ্গা

■ মো. আমানুর রহমান

বন, পাহাড়, সাগর, নদী, খাল-বিল, হাওড়, মেঠোপথ এমনকি ধানক্ষেতও আমাকে টানে, প্রাকৃতিক সবকিছুই টানে। তবে পছন্দের ক্রমানুসারে নিশ্চিতভাবেই বন আর পাহাড় সবার ওপরে। সাইকেল নিয়ে ঘোরার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই! হলিডে রাইডার্স তাদের পরবর্তী ইভেন্ট রেমা-কালেঙ্গা ঘোষণা করার পরই আমি যোগাযোগ করে নামটা লিস্টে যোগ করাই। বলে রাখা ভালো- সব সাইক্লিস্টের জন্য রেমা-কালেঙ্গা ভ্রমণ স্বপ্নের আর রোমাঞ্চের। অনেক অপেক্ষার পর ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর সাইকেলে করে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে রাত ১টায় আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মাধবপুরে হোটেল হাইওয়ে ইনে যাত্রাবিরতি করি। কিন্তু অত ভোরে পথে ডাকাতের কথা মনে হওয়ায় কিছুটা আলো না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত হয়। হালকা নাস্তা সেরে আর ফজরের নামাজ শেষে সকাল ৬টায় হাড় কাঁপানো শীতে আমাদের স্বপ্নের ভ্রমণের শুরু। এই সাইকেল সফরে শীত থেকে বাঁচার জন্য কত জন যে কত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছিল; এর মধ্যে একটার কথা না বলে পারছি না। মোজার স্বাভাবিক ব্যবহার পা সুরক্ষার জন্য হলেও কান সুরক্ষায় যে এটি সমান দক্ষ এই ভ্রমণে না গেলে তা অজানাই থেকে যেত।

একটু পর আমরা ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে ছেড়ে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের রাস্তা ধরলাম। ৫/৬ কিলোমিটার পার হতেই শুরু হলো দিগন্তজোড়া চা বাগান। চা বাগানে এর আগে আমার কখনো রাইড দেয়া হয়নি; সেই অভিজ্ঞতারও পরিপূর্ণতা পেল। কুয়াশার চাঁদর ভেদ করে চা বাগানের ছায়াবৃক্ষের পাশ দিয়ে রবি মামা যখন হামা দেয়া শুরু করল আমরা ভুলে গেলাম প্যাডেল চালানো। সেই দৃশ্য ধারণে ক্যামেরা পুরোপুরি অক্ষম, মানসচক্ষেই তা কেবল উপভোগ্য। পাহাড় সমুদ্র নদীতে অনেক সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সুন্দরবনেও সূর্যোদয় দেখেছি। কিন্তু চায়ের ঘন সবুজ কার্পেটে মোড়ানো টিলাগুলোর পেছনের সূর্যোদয়ের দৃশ্য আমি নিশ্চিত আপনাকেও বাকরুদ্ধ করে দেবে। এর একটু পর সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে জলবিয়োগের বিরতি দিয়ে আবার আমাদের শুরু করি। আমাদের গন্তব্য কালেঙ্গা ফরেস্ট বাংলো। ইট-পাথরের রাস্তা আর মেঠো পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের সিঁড়ির দোরগোড়ায়।

বয়স একটু বেশি হওয়ার সুবিধা অনেক সময়ই পাই। এখানেও সরোয়ার ভাইয়ের রুম বন্টনে ব্যতিক্রম হয়নি। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে আমাদের ট্রেইল শুরু হয়। উঁচু নিচু টিলায় বনজঙ্গলের ভেতর আমাদের পরবর্তী টার্গেট রেমা। একটু পর পর পাহাড়ি আপহিল, ডাউনহিল, ঝিরিপথ। গিয়ারের সঠিক ব্যবহার শেখার আদর্শ স্থান হলো রেমা-কালেঙ্গা রাইড। ঢাকায় যেখানে ২-৪, ৫, ৬ বা ৩-৬, ৭, ৮-এ চালাতে অভ্যস্ত সেখানে ১-২, ৩ চালানো বা চালাতে অভ্যস্ত হওয়া বেশ কঠিন। গিয়ার চেঞ্জে একটু সময়ের হেরফের হলেই চেইন ড্রপ করবে। আমার ক্ষেত্রে দুইবার হয়েছেও।

গাইড ছাড়া অনুমান নির্ভর পথে ১৪ জন কিশোর, তরুণ যুবা আর বৃদ্ধ ঠিকই পৌঁছে গেলাম রেমার অভীষ্ট লক্ষ্যে। সেখানে জুমার নামাজ সারলাম। পাছে শকুনের অভয়ারণ্য দেখতে গিয়ে ফিরতে সন্ধ্যা হয়- সেই ভয়ে সাবধানতার জন্য আমরা রেমা থেকেই আবার ফিরে আসি। ফিরতে ফিরেতে প্রায় বিকাল।

সত্যি সত্যিই পুরোটা পথ ছিল অসাধারণ রোমাঞ্চে ভরা। আপনি রাঙামাটি বান্দরবান বা খাগড়াছড়িতে কিছু দূর পরপর টংয়ে চা খেতে পারবেন, কলা, পেঁপে আনারস খেতে পারবেন। কিন্তু রেমা-কালেঙ্গায় এসবের কোনো কিছুই আশা করবেনই না। চাহিদা মোতাবেক খাবারদাবার আপনার সাথেই নিতে হবে। অবশ্যই শুকনো খেজুর আর পানি সাথে রাখবেন। পুরো রেমা-কালেঙ্গা আপনি প্রচুর প্রাকৃতিক ভূগর্ভস্থ পানির স্বতঃস্ফূর্ত প্রসবণ দেখতে পাবেন। তারই একটার সাহায্য নিয়ে সাইকেলের কাঁদা পরিষ্কার আর লুবিং করা হয়।

অন্যারা রাইড দিয়েই ফিরে আসে, আমাদের এই রাইডের বিশেষত্ব ছিল রাতে কালেঙ্গায় অবস্থান। কোলাহলবর্জিত নির্জনতা উপভোগের জন্য রেমা-কালেঙ্গা অদ্বিতীয়। তাছাড়া পার্বত্য জেলাগুলোর মতো অনেক পর্যটকের ভিড়ও এখানে নেই। আমাদের সব খাবারদাবারের বন্দোবস্ত বাংলোতেই ছিল। সন্ধ্যায় ঝাল পেঁয়াজ আর পিঁয়াজু ছোলার মুড়িমাখা খেতে খেতে বনের নির্জনতা উপভোগও ছিল দারুণ অভিজ্ঞতা। ধূলিকণাহীন পরিবেশে নির্মল আকাশে যখন অগণিত তারকা দেখছি তখনই দেখি চাঁদের বুড়িও ভরা পূর্ণিমায় অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে হাজির। রাতের খাওয়া শেষে চাঁদের আলোতেই মুরগির বারবিকিউ খেয়ে রুমে ফিরে এক ঘুমে সকাল। সকাল ৬টার পর রওনা দিয়ে হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ জেলা স্পর্শ করে রাজধানীর বাসায় যখন রাত ৯টায় পৌঁছাই তখন ১৭০ কিলোমিটার রাইড হয়ে গেছে!

লেখক: ভাইস প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড। ◆

অতিথি পাখি আর লাল শাপলার বাইক্কা বিল

ভ্রমণ গল্প

■ মার্জিয়া লিপি

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বন, হাওড় আর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কাজ করার জন্য নানান রূপে বাইক্কা বিল দেখেছি। পেশাগত জীবনের শুরুতে বন বিভাগে এবং পরবর্তী সময় ইউএসএআইডিতে কাজ করার কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং শ্রীমঙ্গল ও সিলেটের বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, হাওড়, জলাশয়, বিল ও অভয়াশ্রম ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে কাজ করার কারণে শীত আর গ্রীষ্ম দুই মৌসুমেই বাইক্কা বিলকে দেখার সুযোগ হয়েছে। শ্রীমঙ্গলে নির্ধারিত কাজ শেষে রাধানগরের নিসর্গ ইকো কটেজ থেকে ঢাকায় ফেরার পথে রওনা হই বাইক্কা বিলের উদ্দেশে। জেলা সদর মৌলভীবাজার কিংবা শ্রীমঙ্গল থেকে বাইক্কা বিল যেতে কোনো স্থানীয় পরিবহণ নেই। পর্যটকদের যেতে হয় ভাড়া গাড়িতে। শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার সড়ক এবং হাজীবাজার থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে বাইক্কা বিল অভয়াশ্রম। গাড়িচালক শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে সকাল ৮টায় রওনা করে বাইক্কা বিলে পৌঁছাই তখন ঘড়ির কাঁটায় ৯টা বাজতে ২০ মিনিট বাকি। সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা আরএমওর তৌহিদ ভাই হাজীবাজার থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন। আরএমও অফিস থেকে মাত্র পাঁচ টাকা প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে বিলে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ তোরণ থেকে পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে রওনা হয়েছি পাখি দেখতে। দর্শনার্থীদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার সুবিধার্থে বিলের কাছে নির্মাণ করা হয়েছে একটি দ্বিতল অবজারভেশন টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ার থেকে ঘন সবুজ বন ও পুরো বিলের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

সময়টা ছিল বসন্তকাল। অফিসের পেছনে কয়েকটি শিমুল গাছের গাঢ় লাল রঙের ফুল সবুজ ঘাসে পড়ে আছে। অসাধারণ দৃশ্য। হিজল আর করচ গাছের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা পেরিয়ে কিছুটা দূরে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। দর্শনার্থীদের পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে উঠার জন্য গুনতে হয় ২০ টাকা আর নৌকা ভ্রমণ করতে চাইলে ঘণ্টায় দিতে হয় ৬০ টাকা। টাওয়ারে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে কিছুটা দূরে জলাশয়ে পাখি দেখা যায়। দূরে থাকা বিভিন্ন আকারের ছোট বড় পাখিগুলোর রঙ এমনকি কয়েক রঙা পালকের রঙও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কল্যাণে স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সবুজ রঙের শাপলা ফুলের পাতায় পাখি বসে আছে, কোনোটি বা উড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে লাল শাপলার পাশে বসছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বিভিন্ন রঙের পাখির ঝুঁটির নড়াচড়া স্পষ্ট দেখতে সে কি আশ্চর্য আনন্দ!

শীত আর গ্রীষ্ম- এই দুই মৌসুমে এই বিলের প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য দুই ধরনের। নৈসর্গিক প্রকৃতির দৃষ্টিজুড়ে সবুজের হাতছানি। তাই সারা বছর ধরে বিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন প্রকৃত পর্যটকরা। প্রকৃতির এমন রূপ মাধুর্যে সহজেই আকৃষ্ট করে তাদের। বর্ষায় দুই চোখজুড়ে থৈ থৈ পানি। বিশাল জলরাশির মাঝখানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে জেগে থাকে সবুজ পত্রপল্লবের হিজল, করচ আরও নাম না জানা নয়নকাড়া সবুজ জলজ বনের রাজ্য। শীত মৌসুমে একেবারে বিপরীত দৃশ্য। থৈ থৈ করা দিগন্তজোড়া পানি শুকিয়ে জেগে উঠে শুধু সবুজ ঘাসের মাঠ। হিজল-করচের গাছের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে দূরে গালিচার মতো সবুজ মাঠে। তখন পুরো হাওড়জুড়ে গরু-মহিষের বাতান। আর হাওড়ের বিলে খাদ্যের সন্ধানে অবাধ বিচরণ নানা জাতের দেশি ও অতিথি পাখির।

বিলের পাড়ে সবুজ ঘন বন, নানা জাতের গাছ আর জলজ উদ্ভিদের জন্যও এই বিল উদ্ভিদ জীব-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বিলের পাড় ও কূলঘেঁষে হিজল, করচ, নলখাগড়া, ঢোল কলমি আর ফুল ও লতাগুল্ম। কুচুরিপানা, শাপলা ও পদ্ম, ওকল, মাখনা আর সিংড়ার বিশাল সাম্রাজ্য বাইক্কা বিল। স্থায়ী নিবাস গড়া পাখি আর পোকা-মাকড়ের ডাক ও ঝিঁ-ঝিঁ শব্দে বিস্তীর্ণ বিলের নিস্তব্ধতা ভেঙে সৃষ্টি করে অতিপ্রাকৃত ভিন্ন আমেজ। প্রকৃতি যেন এখানে একে অপরের সাথে মিলেমিশে মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি করেছে সমৃদ্ধ একটি ইকো সিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার চা-সমৃদ্ধ শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বাইক্কা বিলের অবস্থান।

শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওড়ের পূর্বদিকের প্রায় ১০০ হেক্টর আয়তনের একটি জলাভূমি এই বাইক্কা বিল। নয়নাভিরাম প্রকৃতির এই বিলের আয়তন ৪২৫ দশমিক ১৫ বর্গকিলোমিটার। বিলটি অসংখ্য অতিথি পাখির কলতান আর বিলুপ্তিপ্রায় দেশি মাছ ও পাখির অনন্য একটি দর্শনীয় স্থান। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় বাইক্কা বিলকে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত অতিথি পাখি আর দেশি নানা জাতের ছোট বড় মাছ ও পাখির নিরাপদ আবাসস্থল এটি। বাইক্কা বিলে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ নানা জাতের পাখি। শীতের মৌসুমে এই বিলে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসা অতিথি পাখিদের অবাধ বিচরণ আর কলকাকলি নজর কাড়ে পর্যটকদের। শীত মৌসুমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকাল-সন্ধ্যায় পাখি দেখতে বাইক্কা বিলে সমাগম ঘটে পাখিপ্রেমীদের। এই সময়ে বিলে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ নানা জাতের ও বর্ণের পাখি দেখা। বিলের সর্বত্র পানকৌড়ি, কানিবক, ধলাবক আর গোবক পাখির সরব উপস্থিতি মুগ্ধ করে সবাইকে। গেওয়ালা বাটান, মেটেমাথা টিটি আর কালাপাখ ঠেঙ্গীর দেখা মিলবে অহরহ। এই বিলের নিয়মিত অতিথি পাখির নাম পান ভোলানি। বিপন্ন তালিকায় থাকা পালাশী কুড়া ঈগল পাওয়া যাবে এই বিলে। এশীয় অঞ্চল থেকে আসা গুটি ঈগলকেও নিশ্চিন্ত মনে উড়তে দেখা যাবে বিলে। বিলের অন্যান্য পাখির মধ্যে, দাগি রাজহাঁস, খয়রা চখাচখি, উত্তুরে ল্যাঞ্জাহাঁস, পাকড়া কোকিল, নীল-লেজ সুইচোরা, পাতি আবাবিল, দাগি ঘাসপাখি, বাংলা শকুন, পাতিচ্যাগা উল্লেখযোগ্য।

মাঝে মধ্যে দেখা মেলে ধুপনি বক ও রাঙা বকের। বিলের প্রবেশপথে ও দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা যাবে লম্বা পায়ের পাখি দলপিপি আর নেউপিপি। বিলের পশ্চিমে দেখা যাবে পান মুরগি ও বেগুনি কালেম। কোথাও দেখা যাবে কালামাথা কাস্তেচরা কাদামাটি ঘাটছে।

মাছ ও পাখি ছাড়াও বাইক্কা বিলে পর্যটকদের বিমোহিত করবে জলজ প্রকৃতির সাহচর্যে জন্মানো নয়নাভিরাম সব ফুল ও লতাগুল্ম। বিলের কূলঘেঁষে দেখা মিলবে হাজারো পানা, শাপলা ও পদ্ম। পরিসংখ্যানে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, বাইক্কা বিলে প্রায় ৯০ প্রজাতির মাছ ও ১৬০ প্রজাতির পাখির অভয়াশ্রম। আইড়, মেনি, কই, ফলি, পাবদা, বোয়াল, রুই, গজারসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আছে এখানে। শুধু মাছই নয়, নানারকম দেশি আর পরি-যায়ী পাখিরও অভয়াশ্রম এই বিল। এছাড়া সন্ধ্যায় বিলে দেখা যাবে বিচিত্র আকৃতির ড্রাগন ফ্লাই বা ফড়িং। জীবনের অধিকাংশ সময় পানির নিচে কাটানো এই প্রাণী পরিণত বয়সে পানির ওপর উঠে পতঙ্গ আকৃতি ধারণ করে।

বাইক্কা বিলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকা সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন বড়গাঙ্গিনা সদস্যদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ইকো সিস্টেম সমুন্নত রাখতে প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা ও সচেতনতার প্রয়োজন। হাওড়ে মাছ বৃদ্ধির জন্য বেশি করে গভীর অভয়াশ্রম ও পাখির নিরাপদ নিবাসের জন্য বনায়নের গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রচেষ্টা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতায় পাখিদের নিরাপদ বসবাস অনেকটাই নিশ্চিত হচ্ছে। সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যরা পালাক্রমে পাহারার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। উচ্চস্বরে কোলাহল অথবা মাইক,

বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর এসব কিছুর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে যাতে পাখিদের নিরাপদ আবাস বিঘ্নিত না হয়। অতিথি পাখির মৌসুমে সংগঠনের সদস্যদের পাহারা সত্ত্বেও স্থানীয় একটি চক্র সুযোগ পেলেই পাখি শিকারে তৎপর হয়ে উঠে। এসব কারণে প্রতিবছরই অতিথি পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অতিথি পাখি ছাড়াও বছরজুড়ে অনেক মাছ শিকারি দেশি পাখির দেখা মেলে। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিল এলাকার জলাভূমিতে মাছ ধরা এবং বোরো ধান চাষের মৌসুমে মানুষের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় অতিথি পাখিদের আবাসস্থলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফলে পরবর্তী বছরে ওই জায়গায় তারা আর আসতে চায় না। এ কারণেই পাখির আনাগোনা কমতে থাকে। অনিরাপদ আবাসস্থল আর খাদ্য সংকট মূলত এ দুইটি বিষয় পাখি কমবেশি হওয়ার অন্যতম কারণ। এসব কারণে বিলের জীব-বৈচিত্র্য ও প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে। বিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে সবার প্রচেষ্টা ও সচেতনতার প্রয়োজন। পরিকল্পিতভাবে সরকার এবং স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় কেবল এই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করা সম্ভব। প্রতিবেশ পর্যটনের লক্ষ্যে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বা পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন প্রয়োজন। বাইক্কা বিলের সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে নিসর্গবিদ, প্রকৃতিপ্রেমী, পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, পাখি বিশেষজ্ঞ ও মিডিয়াকর্মী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফর ও বিভিন্ন রকমের অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ করে থাকেন।

ঢাকায় ফেরার পথে ঘণ্টা দুয়েক থাকার পরিকল্পনা নিয়ে রওনা হয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল থেকে বাইক্কা বিলে। পাখির কলকাকলি আর লাল শাপলার রঙে কখন যে সময় পেরিয়ে যায়! নৌকায় ঘুরে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে রওনা করি অবশেষে ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটা পেরিয়ে একটার ঘরে পৌঁছে যায়। কিন্তু মনে হয় চোখের পলকে পেরিয়ে যায় আমাদের রঙিন সময়। অনেকবার দেখার পর যেন আবারো দেখার তৃষ্ণা জেগে থাকে মনে; মনে মনে বলি আবারো দেখা হবে ফুল আর পাখির সাথে, আরেক ফাল্গুনে।

লেখক : গবেষক ও পরিবেশবিদ। **ছবি :** পল থমসন ◆

ভ্রমণের উপযুক্ত সময়

বর্ষাকাল হাওড়াঞ্চল ভ্রমণের সবচেয়ে আদর্শ সময়। তবে যদি নানা পজাতির পাখির কলকাকলিতে মুখর হতে চান তাহলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন।

যাওয়ার উপায়

শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার সড়কে অবস্থিত কালাপুর বাজার হয়ে বরুনা-হাজিপুর পাকা রাস্তা ধরে হাজিপুর বাজারে যেতে হবে। স্থানীয়দের কাছে এই বাজারটি ঘাটেরবাজার নামে পরিচিত। ঘাটেরবাজার থেকে যেকোন স্থানীয় যানবাহন কিংবা পায়ে হেঁটে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাইক্কা বিলে যেতে পারবেন।

কোথায় থাকবেন

বাইক্কা বিলের কাছেই শ্রীমঙ্গলের অবস্থান। আর শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন মানের আবাসিক হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে।

হরিপ্রভা তাকেদা

ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া নারী ভ্রামণিক

■ **এলিজা বিনতে এলাহী**

আমার ভালোবাসার সমস্ত জায়গাজুড়ে রয়েছে ভ্রমণ। নিজেকে আমি একজন ইতিহাস অনুরাগী ও ইতিহাস প্রেমিক মনে করি। হয়তো কথাগুলো নানা সময়ে অনেকবারই বলেছি। হরিপ্রভা তাকেদার কথা লিখতে গিয়ে আবার নিজেকে বেশি করে ঐতিহ্য প্রেমিক মনে হলো আর প্রীত হলাম। এই ঐতিহ্য প্রিয়তার কারণেই দারুণ এক নারী ভ্রামণিকের সন্ধান পেয়েছি।

গোটা বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনা চিনিয়েছেন আমাকে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। যাকারিয়া স্যারের বই হাতে নিয়ে বাংলাদেশের কোণায় কোণায় ভ্রমণ করে ইতিহাস খুঁজেছি আমি। আর প্রাণের শহর, জাদুর শহর ও ঐতিহ্যের শহরের বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি আমাকে দেখিয়েছেন ড. মুনতাসীর মামুন স্যারের ঢাকা নিয়ে লেখা শতাধিক বই।

২০১৬ সাল থেকে ঐতিহ্য ভ্রমণের যাত্রা শুরু হয়েছিল মুনতাসীর মামুন স্যারের তিন খণ্ডের 'স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী' পড়ার মাধ্যমে। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'ঢাকার প্রথম আধুনিক মহিলা'। এরকম শিরোনাম বোধ করি সবার নজর কাড়বে। প্রথম নাম জানলাম হরিপ্রভা তাকেদা। বলতে দ্বিধা নেই সেই প্রবন্ধে প্রথম জেনেছি ১৯ শতকের একটি অগ্রসর জনগোষ্ঠী ব্রাহ্ম সমাজের কথা। হরিপ্রভা মল্লিক কী করে হরিপ্রভা তাকেদা হয়েছেন; সেটি জেনেও কম আপ্লুত হইনি। জাপান ভ্রমণ, জাপানি নাগরিককে বিয়ে, ভ্রমণ বই 'বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা' সব মিলিয়ে অল্প হলেও ঘোর লাগা একটি সময় কেটেছে একজন নারীকে নিয়ে। তাই হরিপ্রভা তাকেদা নামটি মনে গেঁথে ছিল দারুণভাবে। কিন্তু এমনটি নয় যে, সাথে সাথেই হরিপ্রভা তাকেদাকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি কিংবা কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছি। তারপর জীবনের নানা জটিলতায়, বাস্তবতায় ও ২০১৭ সালে বিদেশে পড়তে যাওয়ার কারণে হরিপ্রভা আমার স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল।

দেশে ফিরলাম ২০১৮-তে, আবার বাংলাদেশের ঐতিহ্য ভ্রমণ শুরু করলাম। নানা বইয়ের সন্ধান করছিলাম ঢাকার বিভিন্ন বুকশপ ও লাইব্রেরিতে। এরই ধারাবাহিকতায় শাহবাগের পাঠক সমাবেশে চোখে পড়লো 'বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা' বইটি। অবাক হলাম! ঘরিপ্রভার বই নতুন করে ছাপা হয়েছে।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রিকশায় বসেই বইটির পাতা উল্টাতে লাগলাম। দুটো নাম সামনে এলো মঞ্জুরুল হক, কাজুহিরো ওয়াতানাবে। একজন প্রবাসী, অন্যজন জাপানি নাগরিক। আজ যদি পেছনে ফিরে তাকিয়ে সেই দিনের মনের অবস্থা সত্যি করে বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে- উনাদের দুজনের সাথে কথা হবে, কাজ করার অভিজ্ঞতা হবে, সেই রকম স্বপ্নের ধার ঘেঁষেও যাইনি। আর ট্রাভেল ডকুমেন্টরি 'হরিপ্রভা তাকেদা: এন আনসাং ট্রাভেলার অব বেঙ্গল' এর ভ্রূণ সাত আসমান থেকেও অনেক দূরে ছিল।

বইটি পড়ার পর হরিপ্রভার নামের স্মৃতিতে যতটুকু ধুলো জমেছিল, সেটি সরে গিয়ে হীরক খণ্ডের মতো চকচক করতে লাগলো। 'বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা' পড়ে হরিপ্রভাকে পুরোপুরি জানার পর, নিজেকে একবিংশ শতাব্দীর একজন আধুনিক নারী ভাবতে লজ্জা লাগছিল।

আমার ঐতিহ্য ভ্রমণ চলতে থাকলো, কিন্তু প্রায়শই হরিপ্রভা একজন নারী ভ্রামণিকের রূপে এসে আমাকে উদ্বেলিত করতে লাগলো। নানা চিন্তা ঘুরপাক করতে থাকে মাথায়, নিজের সাথে কথা বলি অনবরত।

কিন্তু ভাবনার কথা কাউকে বলতে সাহস হয় না। কেউ যদি পাগল মনে করে, হেসে উড়িয়ে দেয়, শব্দে খারাপ কিছু না বললেও যদি আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করে, আমি পারব না। এমনটি যে হয়নি তা নয়। সেসব কথা থাক আজকে।

হরিপ্রভার একটি মাত্র ছবি আর তার ভ্রমণ বই- এইটুকুই আমার সম্বল। এই দুইটি জিনিসকে সম্বল করে কি ২০/২৫ মিনিটের একটি গল্প বলা সম্ভব! সাথে অর্থের চিন্তা তো রয়েছেই। গবেষণা করতে গিয়ে জেনেছি চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল জাপান ফাউন্ডেশনের অনুদানে 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। আর আমি ২০/২৫ মিনিট নিয়ে ভাবনায় ডুবে আছি। একেক জনের গল্প বলার ভাষা একেক রকম। সুতরাং সময়ের তারতম্য হতেই পারে। ধীরে ধীরে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শুরু করলাম। আমার টিমের সাথেও পরামর্শ চলতে থাকলো। টিম বলতে বড় সর যেরকম একটি বিষয় বোঝায়, আমাদের টিম মোটেও সেরকম নয়, প্রতিটি কাজ আমিসহ ২/৩ জন বন্ধু মিলেই করি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটি দুজন মানুষে গিয়ে দাঁড়ায়।

আমার স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ বেশ খানিকটা এগোনোর পর, মুনতাসীর মামুন স্যারের সাথে কথা বললাম ফোনে, স্যারকে বললাম আমার ইচ্ছার কথা। তিনি আমাকে সব রকম তথ্য দিয়ে সহায়তা করলেন। মামুন স্যারের সাথে কাজ শেষ হওয়ার পর, স্যার নির্দেশনা দিলেন প্রয়াত আবুল হাসনাত স্যারের সাথে সাক্ষাতের। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কালি ও কলম অফিসের আর্কাইভের সাহায্য নিতে হয়েছে হরিপ্রভাকে নিয়ে পুরনো লেখাগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য। কালি ও কলমের সম্পাদক প্রয়াত আবুল হাসনাত স্যার প্রচারবিমুখ একজন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হয়েছেন। হরিপ্রভাকে কী করে জানলেন সেই গল্প শুনেছি তার কাছে। সেই গল্পের সুবাদে জেনেছি পশ্চিমবঙ্গের লেখক সুরজিত দাস গুপ্তের কথা। সুরজিত দাস গুপ্ত ছিলেন হরিপ্রভার বোন অশ্রুপ্রভার ছেলে। স্বভাবতই আমি আবুল হাসনাত স্যারের কাছে সুরজিত দাস গুপ্তের সাথে কথা বলবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে সুরজিত দাস গুপ্তের ছেলের মোবাইল নাম্বার দিলেন। ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আমি হায়দ্রাবাদে যোগাযোগ করি। তখন জানতে পারি মাসখানেক আগে লেখক সুরজিত দাস গুপ্ত পরলোকগমন করেছেন। আমি হরিপ্রভার স্মৃতি সংবলিত কিছু রয়েছে কি না উনার পরিবারের কাছে সেই সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু হরিপ্রভার কোনো স্মৃতি তাদের কাছে অবশিষ্ট নেই বলে জানালেন।

আবুল হাসনাত স্যার জাপান প্রবাসী লেখক ও গবেষক মঞ্জুরুল হকের ই-মেইল অ্যাড্রেস দিলেন। স্যারের সাথে যোগাযোগ হলো, কথা হলো। মঞ্জুরুল হক স্যার উনার সহকর্মী ও বন্ধু কাজুহিরো ওয়াতানাবের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দিলেন। জাপানে বেশ ভালো যোগাযোগ স্থাপন হলো। বসে ভাবছিলাম ঢাকার হরিপ্রভা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের সবার কথা শুনেছি, ভিডিও ধারণ করেছি। কিন্তু জাপানে যারা রয়েছেন তাদেরটি কী করে করবো!

এরকম ভাবতে ভাবতে একদিন মঞ্জুরুল হক স্যারের বার্তা এলো তিনি ঢাকায় আসবেন। আকাশের চাঁদ হাতে পেলে কেমন লাগবে জানি না। তবে স্যারের ঢাকায় আসার খবর, আমার এর থেকেও বেশি কিছু মনে হচ্ছিল। স্যারের সাথে প্রথম দেখা হলো, কথা হলো, কাজ হলো। তারিখটি ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। এই যে উনি আশীর্বাদ স্বরূপ যুক্ত হলেন 'হরিপ্রভা তাকেদা: এন আনসাং ট্রাভেলার অব বেঙ্গল' এর সাথে আর আমার সাথে। সেই থেকে শুরু করে এই লেখা অবধি তিনি সেই আশির্বাদের হাত দিয়েই রেখেছেন।

তারপর শুরু হলো বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি। স্থবির হলো পৃথিবী। মাঝে আবুল হাসনাত স্যার পরবাসী হলেন। পৃথিবী কিছুটা আড়মোড়া ভাঙল। সবাই একটু নড়েচড়ে বসলাম। হরিপ্রভা তাকেদাও ভ্রমণ শুরু করলো। কাজুহিরো জাপান থেকে উনার অভিজ্ঞতা ভিডিওতে ধারণ করে পাঠালেন। ধীরে ধীরে টিম কোয়েস্ট প্রথম প্রিমিয়ার শো করবার জন্য তৈরি হলো। ২০২১ সালের ৯ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে তথ্যচিত্র 'হরিপ্রভা তাকেদা'র প্রথম প্রদর্শনী হলো। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানে রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। জাপান থেকে মঞ্জুরুল হক, কাজুহিরো ও তামামি কাওয়াকামি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভিডিওবার্তায়। তামামি কাওয়াকামি জাপানি সাংবাদিক। তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন হরিপ্রভার নাম এর আগে তামামি শোনেননি।

আমি কেন এই ডুকুমেন্টরি তৈরি করলাম? ঘরিপ্রভাকে কেনই বা ট্রাভেলার বলছি!

৬৪ জেলায় ঘুরতে ঘুরতে ইতিহাসে এরকম অনেক হারিয়ে যাওয়া অনন্য নারী আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে হারিয়ে যাওয়া এই নারীদের কাজগুলোকে সামনে নিয়ে আসা উচিত। শুধু দেশের মানুষের জন্য নয়, পুরো বিশ্বের জানা উচিত সেসব বাঙালি নারীর কাজগুলো। আমার দেশ, আমার ভূখণ্ড সমৃদ্ধ সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আমাদের দেশের নারীরা সব যুগেই আধুনিক ছিল। সময়ের গতির সাথে, পৃথিবীর গতির সাথেই তারা চলেছে। হরিপ্রভার কাজই এর বড় উদাহরণ।

হরিপ্রভা অনন্য তিনটি বিষয়ের জন্য। তিনি প্রথম বাঙালি নারী যিনি জাপান ভ্রমণ করেছেন, প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে জাপান সম্পর্কে লিখেছেন, প্রথম বাঙালী নারী যিনি একজন জাপানি নাগরিককে বিয়ে করেছেন। এরকম একজন নারীকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ বা অভিপ্রায় তৈরি না হওয়ার কোনো কারণই নেই।

হরিপ্রভা আর কোনো দেশ ভ্রমণ করেছেন কিনা সেটি জানা যায়নি, আর কোনো ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন কিনা সেটিও জানি না। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে হরিপ্রভা একজন ট্রাভেলার, কারণ তার বইটি শুরু হয়েছে এই কথাগুলো দিয়ে- 'আমার যখন বিবাহ হয়, তখন কেউ মনে করে নাই যে, আমি জাপান যাইবো। কাহারও ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা হইতো আমি একবার যাই। সে ইচ্ছা স্বপ্নেই পর্যবসিত হইতো। কারণ চারদিকের অবস্থা প্রতিকূল। অর্থবল সামান্য, শরীর অপটু, সম্মুখে শীতকাল, আত্মীয়গণের অনিচ্ছা, অনেকের নানা ভয় প্রদর্শন'। হরিপ্রভার এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করছে- তার ভেতরে রয়েছে সুপ্ত এক ভ্রমণপিপাসু মন। ভ্রমণের ছোট ছোট জিনিসগুলো তার দৃষ্টি এড়ায়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলোর বর্ণনা তিনি দারুণভাবে লিখেছেন তার বইতে। প্রতিটি জাহাজের বর্ণনাও দিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত জাহাজগুলো তার পছন্দ হয়নি। রেঙ্গুনে পৌঁছে জাহাজ তার দারুণ পছন্দ হয়েছে। ভ্রমণযাত্রায় তিনি সমস্ত অনুষঙ্গ নিয়েই উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে লিখতেন- সেলাই করতেন, এস্রাজ বাজিয়ে গানও করতেন।

হরিপ্রভার জাপানযাত্রায় আমরা বিভিন্ন শহরের বর্ণনা পাই। নারায়ণগঞ্জ, কলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, সাংহাই, হংকং এবং সর্বশেষ জাপান। সেখানকার প্রতিটি যাত্রা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, কৃষিকাজ, আরও নানা গল্প ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনিতে।

হরিপ্রভার লেখনিতে আমরা সেই সময়ের জাপানের পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাই। জাপানি কাঠের বাড়ি, কাঠের জুতা, ওচা, জাপানি পোশাক- সবই হরিপ্রভার জন্য নতুন ছিল। ইংরেজি নববর্ষের কথাও রয়েছে হরিপ্রভার ভ্রমণ বর্ণনায়। সেই দিন নতুন পোশাক পরার রীতির কথাও তিনি বলেছেন। নাগোয়া থেকে টোকিও ভ্রমণে গিয়েছিলেন হরিপ্রভা। টোকিওর দুটি পার্ক- আসাকু কোয়েন ও অয়েনার বর্ণনা পাওয়া যায় তার বইয়ে। জাপানি খাবারে অনভ্যস্ত হরিপ্রভার কিছুটা অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছে।

হরিপ্রভার বইয়ের সমস্ত বর্ণনা খুব জোরালোভাবে ইঙ্গিত করে যে, হরিপ্রভা একজন ভ্রামণিক ও ভ্রমণ লেখক।

লেখক: পর্যটক ও শিক্ষক ◆

‘স্বর্গের জাহাজ ভাসান’ উৎসব

■ **ইমরান উজ-জামান**

নদীর পাড়ে হাজার হাজার নর-নারীর সম্মিলন। কক্সবাজারের রামুর বাকখালী নদীতে ভাসছে নানা রঙের জাহাজ। বাঁশ, বেত, কাঠ দিয়ে তৈরি খোলসে রঙিন কাগজ আর ককসিটে রঙ্গ করে আর রঙিন কাগজে সাজানো হয়েছে। বিশেষ হাতের ছোঁয়ায়, বিশেষ নকশার এই জাহাজগুলো। যারা জাহাজ তৈরি করেন তাদের স্থানীয় ভাষায় ‘ছেরা’ বলা হয় যার বাংলা ‘কারিগর’। সাজানো ঘরটা চারটা অথবা পাঁচটা লম্বাকৃতির আঞ্চলিক ইঞ্জিন নৌকা পাশাপাশি বেঁধে তার ওপর রাখা হয়েছে। অপূর্ব কারুকার্যে তৈরি দৃষ্টিনন্দন জাহাজগুলো বাকখালী নদীর এদিক ওদিক যাচ্ছে, আসছে। জাহাজে জাদি, মন্দির, সিংহ, সাপ, প্লেন এবং বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতিসহ রাখাইন ধর্মকাহিনীর নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এসব জাহাজে।

রামুর পূর্ব রাজারকুল, হাজারীকুল, হাইটুপী রাখাইন পাড়া, হাইটুপী বড়ুয়াপাড়া, দ্বীপ-শ্রীকুল, জাদিপাড়া ও মেরংলোয়া গ্রাম থেকে মোট ৮টি কল্পজাহাজ ভাসানো হয়েছে। এ বছরের ‘জাহাজ ভাসানি’ উৎসবে বাকখালীর পাড়ে ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমপিসহ ঢাকা থেতে আগত অতিথিবৃন্দ। জাহাজ তৈরির ৮টি সংঘকে দেয়া হয় ক্রেস্ট, শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ঢাকা থেকে আগত ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।

প্রতিটিতে লাগানো মাইক, শিশু-কিশোররা জাহাজে চড়ে নানা বাদ্য বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, চকরিয়া, উখিয়া, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়িসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উৎসবে যোগ দেন উৎসবপ্রিয় মানুষ।

হাইটুকি-শ্রীকুল আর রাজারকুল বাকখালী নদীর দুই পাড়ের গ্রামের মানুষের আজ আনন্দ উদযাপন আর উপভোগের বাইরে কোনো কাজ নেই।

৯ অক্টোবর প্রবারণা, পরদিন ১০ অক্টোবর ‘জাহাজ ভাসানি’ উৎসবে বাকখালী নদীর দুই পাড়ে বসে মানুষের মেলা। বাইপাস থেকে নেরুলোয়া, চৌমুহনী, চেরেংগা হয়ে বাকখালী নদী পর্যন্ত ৭টি বৌদ্ধমন্দির বা ক্যাং। এই ক্যাংগুলোকে কেন্দ্র করে পল্লীতে জাহাজ ভাসানোর আগে থেকে মাসজুড়ে চলতে থাকে আনন্দ আয়োজন।

সারাদিন জাহাজ নিয়ে বাকখালী পরিভ্রমণ ও দুই পাড় থেকে মানুষের অংশগ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় শেষ হয় যুবক-যুবতীদের জাহাজ পরিভ্রমণ। শেষে নৌকা থেকে জাহাজগুলোকে আলাদা করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। কিছু জাহাজ আবার এমনি নদীর পাড়ে পড়ে থাকে।

ইঞ্জিনচালিত নৌকার সারিতে বসানো জাহাজগুলোকে পালকির মতো মনে হচ্ছিল। এই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে না থেকে, মন চাচ্ছিল যুবক-যুবতীদের সঙ্গে উৎসবে অংশ নিতে। রাখাইন বন্ধু উসাই মং যেন মনের কথা বুঝতে পারলেন, বললেন- দাদা উঠে আসেন। উঠে পড়লাম জাহাজে, দেখি স্বর্গের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। জাহাজের এক পাশে বাঁশের মাচানে বসে বাকখালীর নরম পানির ছটায় পরিবেশে স্বর্গের আবেশ যেন বিরাজ করছিল। জাহাজ একবার নদীর এই পাশে ভিড়ে আবার অন্য পাশে। বাকখালীর প্রবল স্রোত জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যুবকরা বুক পানিতে হেঁটে হেঁটে জাহাজ টেনে নিয়ে আসে ঘাটে। এভাবে চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

এই জাহাজ ভাসানোর প্রস্তুতি সেই মাসাধিককাল থেকেই শুরু হয়েছে। প্রতিদিন রাতের খাবার সেরে পাড়ার শিশু কিশোর ও যুবকরা জাহাজ তৈরি করে। ঢোল, কাঁসর, মন্দিরা, বাঁশিসহ নানা বাদ্য বাজিয়ে পাড়া থেকে জাহাজ তৈরির টাকা সংগ্রহ করা হয়। নানা বাদ্যের তালে তালে সমস্বরে গাওয়া হয় বুদ্ধ-কীর্তন অথবা অন্য কোনো গান।

‘শুকনো ডালে ফুল ফুটিল,
স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এল,
কে কে যাবি আয়রে,
বুদ্ধের মতো এমন দয়াল আর নাইরে’

কীর্তনের সঙ্গে সমান তালে চলে নাচও। এভাবে পাড়ার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি এবং নিজের পাড়া ছাড়িয়ে অন্য পাড়ায়ও চলে যায় উৎসাহী এসব শিশু-কিশোরের দল। প্রবারণা পূর্ণিমার আগের দিন পর্যন্ত চলে টাকা সংগ্রহ ও জাহাজ তৈরির এই আনন্দ যজ্ঞ। জাহাজ তৈরির জন্য অর্থ সংগ্রহে গেলে পাড়া-পড়শিরা যার যার সাধ্যমতো সহায়তা দেন। এ সময় কোনো বাড়িতে প্রত্যাশিত অর্থ বা চাঁদা না দিলে ওই বাড়ির ওঠানে দীর্ঘক্ষণ নাচ, গান করে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। দাবি পূরণ হলেই সাধু, সাধ, ধ্বনিতে নেচে গেয়ে ওই বাড়ি ত্যাগ করেন তারা।

প্রবীণদের মুখে শোনা যায়, দুই-চার বছর আগেও রাতের বেলায় কল্পজাহাজ তৈরি এবং পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জাহাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের আনন্দ ছিল আরেকটি উৎসবের মতো।

তিনমাস বর্ষাবাস বা বর্ষাব্রত শেষে সারা দেশে নানা আনুষ্ঠানিকতায় প্রবারণা পূর্ণিমা পালন করা হলেও এই দিনটিকে ঘিরে কক্সবাজারের রামু উপজেলায় বাঁকখালী নদীতে আয়োজন করা হয় জাহাজ ভাসান উৎসব। কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী, চকরিয়ার হারবাং ও খুরুশকুলের রাখাইনেরাও ছোট্ট পরিসরে জাহাজ ভাসান উৎসবের আয়োজন করে। তবে শত বছর ধরে একমাত্র রামুতেই বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাহাজ ভাসান উৎসব পালন করা হয়।

প্রচলিত আছে, আজ থেতে প্রায় দুইশ বছর আগে মিয়ানমারের মুরহন ঘা নামক স্থানে একটি নদীতে মংরাজ স্রাজংবার্ন প্রথম জাহাজ ভাসানো উৎসবের

আয়োজন করেন। সেখান থেকে বাংলাদেশের রামুতে এই উৎসবের প্রচলন হয়। যার বয়স প্রায় শত বছর।

এই জাহাজ ভাসানি উৎসবের ধর্মীয় ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। যা বুদ্ধরা সত্য বলে মানে, মহামতি বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে বৈশালী রওনা করলেন। পথে নাগলোকের মহাঋদ্ধিমান অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নাগেরা বুদ্ধকে সেবা করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। নাগলোকের পাঁচশত নাগরাজ জাহাজসদৃশ্য পাঁচশত ঋদ্ধিময় ফণা বুদ্ধসঙ্গীসহ পাঁচশত ভিক্ষুসংঘের মাথার ওপর বিস্তার করলো। বুদ্ধর প্রতি নাগদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ দেখে দেবলোকের দেবতারা, ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মরা বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে শুরু করলেন। সেই দিন মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা, নাগ সবাই শ্বেতছত্র ধারণ করে ধর্মীয় ধবজা উড্ডয়ন করে বুদ্ধকে পূজা করেছিল। বুদ্ধ সেই পূজা গ্রহণ করে পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সে শুভ সন্ধিক্ষণ ছিল শুভ প্রবারণা দিবস। মূলত এ হৃদয়ছোঁয়া চিরভাস্বর স্মৃতিকে স্বরণ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা, বিশেষ করে রামুর বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রবারণা পূর্ণিমায় বাকখালী নদীতে দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত স্বর্গের জাহাজ ভাসিয়ে প্রবারণা উদযাপন করেন।

রাখাইদের অন্যান্য উৎসবগুলোর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ এই ত্রিবিধ স্মৃতিবিজড়িত বৈশাখী পূর্ণিমা।

গৃহত্যাগ সন্ন্যাস গ্রহণ বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর প্রতি ধর্মচক্র প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রথম ধর্মপ্রচার ত্রিবিধ ঘটনার সাথে বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা বর্ষাব্রত।

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন তারা সাংরাই উৎসব পালন করেন। জলকেলি বা লেই খেখু সাংরাইয়ের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় পর্ব।

আষাঢ়ি পূর্ণিমা তিথিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজের কৃত অপরাধ পাপ করে পরিশুদ্ধ হয়। আকাশে ফানুস বাতি উড়িয়ে তারা পুণ্য সঞ্চয় করে।

প্রবারণা পূর্ণিমা অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার পরবর্তী পূর্ণিমা দিনের মধ্যেবর্তী সময়ে কঠিন চীবর দান উৎসব হয়। দানের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে কঠিন চীবর দান। রাখাইন নারীরা তাঁত স্থাপন করে। রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে চীবর করে সংঘের নির্বাচিত ভিক্ষুকে চীবর দান করে থাকে। ত্রিচীবর হলো- সংঘটি, উত্তর এবং অন্তরবাসক। একদিনে বুনে কাপড় দান করা হয় বলে এর নাম চীবর দান।

রাখাইন বিয়ের আছে ভিন্নতা, সাধারণত ফসল তোলার মৌসুমে রাখাইরা বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। দুই পক্ষের সম্মতিতে ভালো দিন তারিখ দেখে আংটি পরানো হয়। বিয়ের কয়েক দিন আগে থেকে চলে ছেলে ও মেয়ে বাড়িতে উৎসব। মেয়ের বাড়িতেই হয় বিয়ের প্রধান আয়োজন। পাত্রপক্ষ বাজি ফুটিয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কনেবাড়ি আসে। ঐতিহ্য অনুযায়ী বরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও একটি লম্বা দা, পাখা, তামাক খাওয়ার পাইপ সাথে নিয়ে আসে বরপক্ষ। বিয়ের আসরে বর-কনের জন্য সজ্জিত মঞ্চে বসে বরকে নাস্তা ছাড়াও তবারক দেয়া পান খেতে দেয়া হয়। লগ্নে কনেকে বরের পাশে বসানো হয়। বয়স্ক একজন বিশেষ পায়েস খাইয়ে দেন বরকে। বর-কনে একে অন্যকে খাইয়ে দেয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী বিয়ের দিন বর পরে লুঙ্গি, ফতুয়া ও পাগড়ি এবং কনে পরে লুঙ্গি, ব্লাউজ। ওড়নার মতো একখণ্ড কাপড় বদল হয়। ৩-৪ দিন পর কনেবাড়ি থেকে কনে নিয়ে বর নিজের বাড়ি যায়।

মৃত্যু রাখাইনদের অন্যতম বড় উৎসব। রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'জন্মে কাঁদো, মৃত্যুতে হাসো।' গৌতম বুদ্ধের মতানুসারে, 'জীবন হলো দুঃখের অসীম সমুদ্র। জীবনের একমাত্র চাওয়া হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তি। আর এই নির্বাণ আসে মৃত্যুতে। তাই মৃত্যু আনন্দের ও অপার শান্তিময়।' সেই মতানুসারে রাখাইনেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত করে জীবনকে স্মরণীয় করে তোলে। যাকে রাখাইন জাতির ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির অংশ বলা যায়। বিশেষ করে রাখাইন পুরোহিতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আয়োজন হয় বর্ণিল উৎসবের।

রাখাইন সমাজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্মের সূত্র পিটকে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী বর্ণিত আছে 'জাতক' হিসেবে।

লেখক : সাংবাদিক, পরিব্রাজক ও লোক গবেষক ◆

প্রতিদিন

নৌ বিহার বুকিং চলছে

শীতলক্ষ্যা, মেঘনা ও বুড়িগঙ্গায়

উপভোগ করুন

ডিনার ক্রুজ (বিকাল ৪:০০- রাত ৮:৩০)
মর্নিং ক্রুজ (সকাল ৯:০০ - বিকাল ৩:০০)
ডে লং ক্রুজ (সকাল ৯:০০ - বিকাল ৫:০০)

কর্পোরেট ইভেন্টস ও পিকনিক, ফেয়ারওয়েল ডিনার
ফ্যামিলি আউটিংসহ সকল উৎসবে

DHAKA DINNER CRUISE
www.dhakadinnercruise.com

যোগাযোগঃ ০১৮১৯২২৪৫৯৩
০১৭৩০৪৫০০৯৯

PRESENTED IN BANGLADESH BY

YOUR™ TRAVEL
Partner for life...

MEMBER OF WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL

MASTER FRANCHISE FOR INTERNATIONAL LOCATIONS

FLY™ Dining

UK | INDIA | SRI LANKA | BANGLADESH | MALAYSIA | INDONESIA | UAE | THAILAND
FRANCHISE

MOST AMAZING HIGH-END EXPERIENCE IN THE WORLD

ভ্রমণ গল্প

জলপথে চিলমারী

■ **হোমায়েদ ইসহাক মুন**

বেড়াই বন্ধুদের দল বিটিইএফ এই বছরই ২২-শে পা দিতে যাচ্ছে। অতিমারি মহামারি সব কাটিয়ে আমরা প্রায় দুইটি বছর পর আবার একসাথে বেড়িয়ে পড়লাম। সবাই একসাথে বের হতে পারলে অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে। মানুষগুলোর মনের বয়স আর ভ্রমণের আগ্রহ এতটুকুও কমেনি। সেই পুরনো দিনের মতো বিস্তর গবেষণা আর আগাম যোগাযোগ করে অনেকগুলো নদী দেখার পরিকল্পনা করা হলো।

মে মাসে আমরা রওনা হলাম। বর্ষার মৌসুম চলে এসেছে। নদীতে পানি ভরপুর। এটাই উত্তম সময় নদী ভ্রমণের। তার আগে একটু বলে নিই- নদ আর নদীর পার্থক্য আছে শাখা প্রশাখার মধ্যে এমনটাই আমাদের সর্বসাধারণের ধারণা। আসলে ব্যাপারটি ভিন্ন। নদ ও নদীর সাথে শাখা থাকা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। এই দুয়ের মাঝে যা পার্থক্য আছে তা হলো ব্যাকরণগত। বাংলা, হিন্দি, ফারসি ইত্যাদি ভাষার ক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দ সাধারণত অ-কারান্ত এবং নারীবাচক শব্দ আ-কারান্ত বা ই, ঈ-কারান্ত হয়। যেমন- রহিম (অ-কারান্ত), রহিমা (আ-কারান্ত, নামের শেষে আ আছে), রজক (অ-কারান্ত), রজকী (ঈ-কারান্ত, নামের শেষে ঈ আছে)। তেমনিভাবে ফুল-ফুলি, কুমার-কুমারী, নদ-নদী ইত্যাদি। তাই যে সব নদীর নাম পুরুষবাচক অর্থাৎ অ-কারান্ত সেগুলো নদ আর যেগুলোর নাম নারীবাচক অর্থাৎ আ-কারান্ত বা ঈ, ই-কারান্ত সেগুলো নদী। এই কারণে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী থাকলেও এটি নদ। একই কারণে নীল নদী নয় নদ। অনেকে আমাজন নদী বললেও উপরোল্লিখিত কারণে তা হবে নদ।

রাত সাড়ে ৯টায় রাজধানীর এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। দলে ১৪ জন। পুরনো সেই মুখগুলো আবার একত্র হলাম। নতুনদের মধ্যে দোলন আর বিদ্যুৎ ভাই মুখ চেনা থাকলেও একসাথে ট্রিপে যাওয়া হয়নি। টিকিট চাইতে টিটি আসলে রবিন ভাই বলে উঠলো- 'আমি রেলমন্ত্রীর জামাই'। সবাই একযোগে হেসে উঠলাম। ভোর সাড়ে ৬টায় কুড়িগ্রাম স্টেশনে নামার পরই শুরু হলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। বাংলাদেশের উত্তরের শেষ প্রান্তে এই কুড়িগ্রাম স্টেশন। ছিমছাম আর ভিড়ভাট্টা কম। স্টেশনের সাথে লাগোয়া হোটেলে আমরা নাস্তা সেরে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। তিন মরতবা চা খাওয়া হয়ে গেল, তাও বৃষ্টি থামার নাম নেই। স্টেশনের শেষ মাথায় অল্প হেঁটে গেলে টকটকে লাল কৃষ্ণচূড়ার তল। বৃষ্টি মাথায় এই স্নিগ্ধ সকালটা একটু উপভোগ করে নিলাম।

সকাল ১০টা বেজে গেল বৃষ্টি থামতে। তারপর এক অটোয় গাট্টি-বোচকা ও শুকনো খাবার-দাবার এবং অন্য তিনটিতে আমরা সবাই চাপাচাপি করে রওনা হলাম যাত্রাপুরের পথে। ঘাটে আমাদের জন্য নৌকা বাঁধা আছে। ধরলা নদীর শাখার ওপর ভাঙা সেতু পার হওয়ার পর ভালো লাগা আরও দিগুণ হলো। এখানে হালকা বসতি, বড় কোনো গাছ চোখে পড়লো না। ধান উঠতে শুরু করেছে এখন, বৃষ্টিটা আর দুই দিন পর এলে চাষিদের কষ্ট থাকত না। যাত্রাপুর যখন গিয়ে নামলাম তখন ভরদুপুর। নৌকায় তিনদিন থাকার জন্য সদাইপাতি কিনতে আমরা কজনা বাজারের দিকে গেলাম। শুক্রবার বলে বেশিরভাগ দোকানই ছিল বন্ধ। টাঙ্গুয়ার হাওড়ের মতো গুছানো নৌকা নয় এটি। সবকিছু আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সুতরাং খানা-দানা, সদাইপাতি, থালা-বাটি সবকিছুর আয়োজন করেই নৌকায় উঠতে হলো।

তিনদিনের জন্য বাজার করলাম- চাল, ডাল, মুরগি, সবজি, মোটা সাদা প্লাস্টিক, আরও টুকটাক সদাইপাতি। রান্না করার জন্য গ্যাসের চুলা ও সিলিন্ডারের ব্যবস্থা আছে। এবার মনে হচ্ছে একটু আরাম করে রান্না করতে পারব। নৌকা ট্রিপে রান্না নিয়ে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়। নৌকাটির গলুই বেশ চওড়া, দুইজন পাশাপাশি শুয়ে জলের সৌন্দর্য দেখতে পারবে। শক্তপোক্ত বাঁশের ছই আছে। এর ওপর জনা দশেক বসা যাবে। নাওয়ের শেষ প্রান্তে কাঠের ওপর তক্তা আর শক্ত বেড়া দিয়ে টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিচে চাপাচাপি করে আমাদের ১৪ জনের শোয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নৌকার মাঝি আছেন তিনজন। কুড়িগ্রামের শাহজাহান ভাই আমাদের এই নৌকা ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন পরশুদিন।

দুধকুমার নদীর উজান ধরে আমাদের নৌকা চলতে শুরু করলো। আজকে এবং আগামীকাল কেবল উজানের দিকেই চলতে থাকব আমরা। চিলমারী বন্দর থেকে আরও উত্তরে ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে আবার ভাটির দিকে ফেরত আসব। নদীটার দুই পাড়ে বালি আর বালি। দূরে দূরে ঘরবাড়ি। মাঝে মাঝে তিনকোনা নীল রঙা ঠেলা জাল দিয়ে কেউ কেউ মাছ ধরছেন। উজান থেকে ঢল নামছে জোরে। এটা হচ্ছে সেই নদী যে নিত্যই এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে। নদীটা আঁকাবাঁকাও বটে। আমরা চলার পর থেকেই পূবধারে ভাঙনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। নদীর মাঝখানেও এক দুজায়গা উঁচু হয়ে থাকতে দেখলাম। মনে হলো সদ্য প্রসূত চর; চরগুলোর এখানে সেখানে দুচার গাছি ঘাস দেখলাম। কাছে পিঠে দেখলাম কিছু ধ্যানী বক আর মাছরাঙা। আকাশে মেঘ জমে আছে। দুধকুমার নদীতেও বহমান স্রোত। নৌকার সামনের অংশটা মাখন জায়গা। কয়েকজন জায়গাটা আগেই দখল করে বসে পড়েছে। নৌকার চোখা জায়গায় পানি কেটে যাওয়া দেখা যায়। যেন মেঘ ফুঁড়ে নীল আকাশের বুকে ঢুকে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সবার চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। হাঁড়িতে চা বসালাম।

সন্ধ্যা যখন রাতে গড়াল তখন আমরা নৌকা থামানোর কথা ভাবলাম। আয়নালের ঘাটে নৌকা থামলো। উপজেলা নাগেশ্বরী। পল্লব ভাইয়ের কাছে জানলাম, কুড়িগ্রামে সাড়ে চারশ চর আছে। সংখ্যাটা অবাক হওয়ার মতোন। বসতি আছে যে চরগুলোয় তার সবগুলোতেই বিদ্যুৎ আছে। তবে চরের লোক পাকা ঘর বাধে না। বসতিগুলো বয়স্ক হওয়ার সময়ও পায় কম। বার বারই ভাঙাগড়ার মধ্যে থাকতে হয় তাদের। বড়জোড় মসজিদটা হয় পাকা আর তা নদীর ধার থেকে দূরেই হয়।

কুড়িগ্রাম কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ধান, গবাদি পশু আর মাছ নিয়েই তাদের জীবন। কোনো কোনো চরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই। ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত আয়নালের ঘাটে লোকসমাগম থাকে। স্থলপথে যারা বগুড়া থেকে, রংপুর থেকে বা ঢাকা থেকে এসে পূবপাড়ে যেতে চান তারা এই ঘাটের ওপরই নির্ভরশীল। পারাপারের নৌকাগুলো ফেরি কিছিমের।

আমরা ঘাটে এসে জুয়েল চাচার দোকানে চা খাই আর আড্ডা দিই। চাচা আমাদের এখানে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্যটাকে ঠিক মেলাতে পারছিলেন না। বিশ্বাসযোগ্য করতে আমাকে আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আপনারা খালি খালি এখানে বেড়াইতে আহেন নাই, নিয়শ্চই অন্য কামে আইছেন'। আমি চাচাকে যতই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি, কাজ হয় না।

পরদিন সকাল সাড়ে ১০টায় আজগর মাঝি নাও ছাড়লেন। আমরা ভূরুঙ্গামারীর দিকে এগোতে থাকলাম। এই অঞ্চলে রুই মাছকে ভূরুঙ্গা বলা হয়। আসলে এখানে রুই মাছকে তিন নামে ডাকা হয়। একদম ছোট থাকতে ভূরুঙ্গা, একটু বড় হলে ডোমনা আর বড় মাছকে রুই বলে।

ঘণ্টাখানেক পর জেগে ওঠা চর দেখে অভিজিৎ উৎফুল্ল হয়ে নৌকা থামাতে বলল। চরটার খাড়া পাড়, চত্বরটা সবুজে মোড়ানো। নাম ফকিরের চর। আমরা নেমে পড়লাম। দোলন ড্রোনের যন্ত্রপাতি সেট করে উড়াতে শুরু করে দিল। অভির বুদ্ধিতে আমরা খাড়া পাড়ে পা দুলিয়ে বসলাম। দোলন ছবি তুলল টপাটপ।

চলতে চলতে সূর্য যখন পশ্চিমে হেলেছে তখন আধা ডোবা চর দেখে আমরা থামলাম। জাল দিয়ে কয়েকজন মাছ ধরছিলেন, তাদের কাছ থেকে তাজা মাছ কেনা হলো। রাতে সেই মাছ ফ্রাই আর ভুনা করলাম। খেতে বসে বুঝলাম অমৃত।

যেতে যেতে বিকাল নামলে সোনাহাট সেতু দেখতে পেলাম। সেতুটা দেখার আগ্রহ ছিল সবারই। এটি উপজেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার পূবে বঙ্গ সোনাহাট ইউনিয়নে পড়েছে। স্থানীয়রা একে পাটেশ্বরী সেতু নামেই বেশি চেনেন। সেতুর এক কিলোমিটার দূরে পাটেশ্বরী বাজার এককালে দারুণ জমজমাট ছিল।

শুরুর দিকে ছিল রেল সেতু এখন সড়ক সেতু। তিনটি যুদ্ধের সাক্ষী এই সেতু তার মধ্যে দুটিই বিশ্বযুদ্ধ। ইতিহাস বলছে, ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য ও রসদ পরিবহণের জন্য লালমনিরহাট থেকে ভূরুঙ্গামারী হয়ে মনিপুর যাওয়ার জন্য গোয়াহাটি পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করে। তারই অংশ হিসেবে এটি তৈরি করা হয়। সৈতুটি ১২০০ ফুট দীর্ঘ। একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা এর একটি অংশ ভেঙে দেন যেন পাকবাহিনীর চলাচল ব্যাহত হয়।

এই নদী পথ ধরে গিয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা (১৫৯১-১৬৬৩)। তিনি ঢাকা ও এর আশপাশে সৈন্য চলাচল, যন্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ পরিবহণের নিমিত্তে দুটি রাস্তা ও সেতু তৈরি করেছিলেন। কয়েকটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংহত করার স্বার্থে।

ফিরতি পথে দুধকুমার পেরিয়ে আমরা পেলাম ধরলার মুখ, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তার মুখ তারপর যমুনা। কুড়িগ্রাম থেকে গাইবান্ধার ওপর দিয়ে এলাম জামালপুর।

এরপর ঢাকার বাস ধরবো। উজান ভাটির এই নদীতে ভাসতে ভাসতে স্মৃতির পাতায় আরও কিছু সুন্দর সময় যোগ হলো।

লেখক: পরিব্রাজক। **ছবি:** আভিজিৎ নন্দী ও দোলন। ◆

ইতিহাস ঐতিহ্য

ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির

বাংলায় রেনেসাঁর ঐতিহ্য

■ মো. জিয়াউল হক হাওলাদার

আঠারো শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে তৎকালীন ব্রিটিশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শাসনাধীন বঙ্গীয় অঞ্চলে উদারতাবাদ ও আধুনিকতার দর্শন নিয়ে যে বেঙ্গল রেনেসাঁ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তাতে ব্রাহ্ম সমাজ অনস্বীকার্যভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, বেঙ্গল রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের সাথে এবং শেষ হয়েছিল নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে। উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও। তিনি উনিশ শতকের হলেও এখনো আমাদের কাছে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত তার বিভিন্ন অবদানের জন্য, বিশেষ করে বিধবা বিয়ে আন্দোলনের জন্য। বিদ্যাসাগর একটি আলোকিত সমাজ গঠনের জন্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। যদিও বঙ্গীয় নবজাগরণ আন্দোলন প্রধানত বাঙালি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দিয়ে পরিচালিত হতো। তবে কিছু বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্ব এখানে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক উত্তর ভারতীয় সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণভাবে এক পরিবর্তনমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- বিদ্রোহী কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরিবার। তারা এই উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতীয় পরিচয় গঠন ও দেশভাগ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবিতা, বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে লেখা এবং মানবতা ও প্রেমের গান বাংলার রেনেসাঁকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

বেঙ্গল রেনেসাঁ তথাকথিত প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মীয় ভূমিকা, বর্ণপ্রথা, যৌতুক, সতীদাহ ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছিল। রেনেসাঁর পূর্বে আন্তঃধর্মীয় বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের সাথে সাথে আন্তঃধর্মীয় বিয়ে শুরু হতে থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় বিয়ের স্বীকৃতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এটাও উল্লেখ করা জরুরি যে, বাংলার নবজাগরণের সময় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভূমিকা ছিল বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানীর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- রেডিও সায়েন্সের জনক জগদীশ চন্দ্র বসু, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভাবক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রসায়নবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখার্জি প্রমুখ। বঙ্গীয় নবজাগরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ভারতীয় সমাজ বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শৈল্পিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। ব্রাহ্ম সোসাইটি সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম সামনে চলে আসে। এরা হলেন- রাজা রামমোহন রায় ও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদেরকে ইতিহাসের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক হিসেবে স্মরণ করা হয়। এই মহান ব্যক্তিত্বদের অনেক উদ্যোগের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ।

বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটা দূরত্বে সদরঘাটের পাটুয়াটুলি এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে মন্দিরটি অবস্থিত। আগে এটি পূর্ব বাংলা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে যেমন বলা হয়েছিল হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড় সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। ঠাকুর বংশের সদস্য হিসেবে ১৮৮৪ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি হন।

ব্রাহ্ম সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ধর্মীয় গোঁড়ামি, অত্যধিক অপচয়, মূর্তি পূজা, যৌতুক ইত্যাদি দূর করা এবং নারী শিক্ষা ও বিধবাদের বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়া। এই আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ঢাকার বহু যুবক তা গ্রহণ করেন। যদিও এটিকে একটি সার্বজনীন ধর্ম করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে এটি শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের একটি শাখায় পরিণত হয়

ব্রাহ্ম সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল- ধর্মীয় গোঁড়ামি, অত্যধিক অপচয়, মূর্তি পূজা, যৌতুক ইত্যাদি দূর করা এবং নারী শিক্ষা ও বিধবাদের বিয়ের স্বীকৃতি দেওয়া। এই আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ঢাকার বহু যুবক তা গ্রহণ করেন। যদিও এটিকে একটি সার্বজনীন ধর্ম করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে এটি শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের একটি শাখায় পরিণত হয়। ১৮৮৬ সালে দীননাথ সেন ঢাকার ব্রাহ্মদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করেন। এজন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চার ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর স্থাপিত ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত আয়তাকার মন্দিরটি ব্রিটিশ স্থাপত্য শৈলী অনুসারে নির্মিত। এই মন্দিরে পাঁচটি চওড়া ধাপে উঠার পর প্রবেশ করা যায়। সিঁড়ির মাঝখানে একটি খোলা খিলান পথ রয়েছে। এই মন্দিরটির আয়তন ১০০ ফুট বাই ৫৫ ফুট। মন্দিরের চারপাশে একটি ১৫ ফুট চওড়া বারান্দা ও মাঝখানে একটি বিশাল হলরুম রয়েছে। হলরুমটি হলো ৫৫ ফুট লম্বা, ২২ ফুট চওড়া ও ২১ ফুট উঁচু। এ মন্দিরে প্রতিমা পূজা হয় না। ব্রাহ্ম সমাজের গায়করা মঞ্চের সামনে বসে বিভিন্ন গান গান। শিক্ষা ও সাংবাদিকতাসহ ঢাকার অনেক সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্রাহ্ম সমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ঐতিহ্যবাহী শহর ঢাকা পরিদর্শনের সময় পর্যটকরা সমাজ বিবর্তন ও বাংলার রেনেসাঁর প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে জানতে এই মন্দিরটি দেখতে চান। মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা অনেক স্লোগান পর্যটকরা দেখতে পাবেন; যা সার্বজনীন মানবতার বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে অনেক দর্শনার্থী বই পড়ে সময় কাটান। ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরটি দেখার জন্য পর্যটকরা ঢাকা শহরের যে কোনো স্থান থেকে গুলিস্তান হয়ে বাসে করে সদরঘাট যেতে পারেন। বাংলাবাজার পয়েন্টে বাস থেকে নেমে ডানদিকে পাটুয়াটুলির দিকে মোড় নিতে হবে। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছতে পারবেন। প্রাইভেটকারেও এখানে আসতে পারেন। তবে পুরান শহরে রিকশা যাত্রাই ভালো।

বর্তমান সময়েও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী সমাজ গড়ে তোলার জন্য সেই সময়কালে সংঘটিত বাংলার নবজাগরণের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ধর্মীয়ভাবে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই দর্শনকে সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা বাংলার নবজাগরণ এবং ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের প্রচার ও প্রচার কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুরু করতে পারি।

লেখক: ব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন। ◆

ক্যান্ডির কোলে

■ **জাকারিয়া মন্ডল**

রোদজ্বলা দুপুর। কিন্তু হুটহাট বেরসিক মেঘের বেয়াড়াপনা। মাঝে মধ্যে তাই মুখ ভার আকাশের। মেঘের ছায়ায় দুপাশের সবুজে ছাওয়া পাহাড় কখনো কালচে, কখনোবা জ্বলে উঠছে রোদের আলোয়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বত শ্রেণির মাঝখানে লম্বাটে উপত্যকাও সমান্তরালে বিস্তৃত। রাস্তা আর পাহাড়ের মাঝখানে দূরত্ব খুবই কম। রাস্তার দুপাশের ছোট ছোট শহর, জনবসতিগুলো তাই লম্বাটে জ্যামিতিক নকশা হয়ে পর্বত পাদদেশে শায়িত। গায়ে গা ঠেকানো ভবন, ঘর-বাড়ি।

ভরদুপুরে যান চলাচল কম। কোথাও যানজট নেই। পিচঢালা মসৃণ পথে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে শ্রীলংকার সবচেয়ে বড় ঐতিহ্যবাহী ট্রাভেল কোম্পানি এইটকেন স্পেন্সের ট্যুরিস্ট বাস। ভেতরে সহনীয় শীতলতা। আয়েশি আসন। জানালার কাঁচ গলে দ্বীপদেশ শ্রীলংকার প্রকৃতি পাঠে নিমগ্ন বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছয় ভ্রামণিকের অনুসন্ধানী চোখ। কান খাড়া করে শুনছে ট্যুর গাইড লেকচারার সুদেশ বিক্রমাসিংহের বয়ান। শ্রীলংকান ট্যুরিজম প্রমোশন ব্যুরোর আমন্ত্রণে এতো দূর এসে কোনো কিছুই হেলায় হারাতে রাজি নয় কেউ।

সেই সকালে ডাম্বুলা জেলার হোটেল কানডালামা হেরিটেন্স থেকে শুরু হয়েছে যাত্রা। তারপর সিগিরিয়া রক জয় করে ছুটছে তো ছুটছেই। মধ্যপ্রদেশের উত্তর প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে দুপুর নাগাদ মাতালে জেলাও পেছনে পড়ে গেল। কুডুগালা পার হওয়ার পর হাতের ডানে সঙ্গী হলো পিনগা ওয়ি খাল। রাস্তার পশ্চিম ছুঁয়ে লেগেই রইলো যাত্রাপথে।

পড়ন্ত বিকালে পিনগা ওয়ি খালের পতিত মুখের দেখা মিললো। মিশেছে মহাবেলি গঙ্গার সঙ্গে। ৩৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাবেলিই শ্রীলংকার প্রধান নদী। এর জন্ম দক্ষিণে, এই মধ্যপ্রদেশেরই উচ্চ ভূমিতে। নুয়ারা এলিয়ার হর্টন ন্যাশনাল পার্কে। আর দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ত্রিনকোমালে বে-তে, বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সেখানে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় তৈরি করেছে এই নদী। এর অববাহিকার আয়তন ১০৪৪৮ বর্গকিলোমিটার; যা গোটা শ্রীলংকার মোট আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ প্রায়। শ্রীলংকার পাওয়ার সোর্স মূলত জলবিদ্যুৎ; যার ৪০ শতাংশই যোগান দেয় মহাবেলিতে গড়ে তোলা গোটা ছয়েক প্রকল্প। যাত্রাপথে বারবার দিক পরিবর্তন করেছে মহাবেলি গঙ্গা। এই যেমন এখানে, পিনগা ওয়ির পতিত মুখের কাছে অনেকটা ভি আকৃতির মোচড় নিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এসে পূর্ব দিকে একটু ঘুরে ফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়েছে। তাতেই তৈরি হয়েছে একটা ভি আকৃতির উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপটাই ক্যান্ডি শহর। শহরের দক্ষিণ দিকটাকে ভিত্তিভূমি ধরলে উত্তর প্রান্তটা নিশ্চয়ই তার চূড়া। পাহাড়ি এই শহরটাকে তাই আকৃতিতেও পাহাড়ের মতোই মনে হয়।

মহাবেলির পাশাপাশি খানিক এগিয়ে উত্তর সীমানার চূড়ার পাশ দিয়েই ক্যান্ডি শহরে প্রবেশ করলো ট্যুরিস্ট বাস।

ক্যান্ডির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০০ ফুট উঁচুতে। এই শহর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। কলম্বোর পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। শ্রীলংকার প্রাচীন রাজাদের সর্বশেষ রাজধানী। প্রায় ৩০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের শহরে জনসংখ্যা লাখ দেড়েক। অধিবাসীদের অধিকাংশই সিংহলী। তবে তামিল ও মুর গোষ্ঠীর বসবাসও আছে। ক্যান্ডি নামটি চালু আছে ঔপনিবেশিক সময় থেকে। তার আগে এখানে ছিল নানা নাম। নানা কিংবদন্তি। সবগুলোরই সারমর্ম ছিলো 'মহান শহর'। কলম্বো থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১১৬ কিলোমিটার। উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় ক্যান্ডি শহর তুলনামূলক আদ্র ও শীতল। তবে সার্বিক বিচারে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। বছরের গড় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে এখানে।

পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম শহর। বহুতলের বড়ই অভাব। রাস্তার দুপাশের অধিকাংশ ভবন ঐতিহ্যের আবহ বইছে। শেষ বিকালে ট্যুরিস্ট বাস থামলো 'দ্য স্যাক্রেড টেম্পল অব টুথ' এর সামনে।

চৌহদ্দির ভেতরে নানা প্রজাতির গাছ। ফুলের ঝোপ, ভাস্কর্য। পিলারের ওপরে দণ্ডায়মান একটা ভাস্কর্যের উঁচু করা হাতে একটা পাখি বসা। চুপচাপ। শেষ বিকালের আলোয় ওটাকেও ভাস্কর্য বলেই ভ্রম হলো। সেই ভুল ভাঙাতেই যেন উড়াল দিলো পাখিটা। একটু সামনেই পবিত্র দাঁতের মন্দির। তার ওপরে অনেক পাখির আয়েশি উড়াউড়ি। এতক্ষণ দলছুট হয়ে থাকা পাখিটা গিয়ে যোগ দিলো তাদের দলে। একটু পর তাকে আর আলাদা করে চেনা গেল না। ওপরে পাখির ঝাঁক। নিচে অনিন্দ্য সুন্দর মন্দির ভবন। সোনালী ছাদ। খাঁজকাটা সাদাটে দেয়াল। অবয়বে ঐতিহ্যের স্ফুরণ। চুনাপাথর, মার্বেল, কাঠ, হাতির দাঁতের তৈরি অনন্য এক স্থাপনা।

সামনের ও পাশের চত্বরজুড়ে অগণিত মানুষের যাওয়া-আসা। কিন্তু কোথাও জটলা নেই। হই-হট্টগোল নেই। সামনের চত্বর থেকে একটু ঘুরে ডানে এগোলে মূল মন্দিরে প্রবেশের ফটক। পবিত্র মনে মন্দিরে ঢুকছে ভক্তরা।

ভেতরে একগুচ্ছ ভবন। একেকটা একেক নির্মাণশৈলীতে গড়া। কতো রঙ! কতো নকশা! প্রতিটিরই আলাদা আলাদা তাৎপর্য। পাথরের স্তম্ভে নকশা উৎকীর্ণ। গর্ভগৃহের সামনে সারি করে রাখা অতিকায় হস্তিদন্তগুলো যেন শ্রদ্ধায় নত। ছাদে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি। নকশি ঝালর। কোথাও কাঠের, কোথাওবা পাথরের সিঁড়ি।

কোথাও আবার সিঁড়িতেও ভাস্কর্য উৎকীর্ণ।
দোতলার গর্ভগৃহের সামনে প্রার্থনায় রত অগণিত ভক্ত। লাল, নীল পদ্মকলিসহ নৈবেদ্য হাতে নিয়ে মানুষের আসা-যাওয়ার মিছিলটা চলছে তো চলছেই। মন্দিরের ওপাশের চত্বরে সারি সারি প্রদীপে আলোর নৈবেদ্য। ক্যামেরার চোখে আলোর পবিত্রতা ধরবেন বলে আবীর আবদুল্লাহ ছুটলেন সেদিকে। পেছন পেছন শাকিল বিন মুশতাক।
এই মন্দির শ্রীলংকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ঐতিহ্য। বুদ্ধের একটি দাঁতাবশেষ এখানে সুরক্ষিত। কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত সেই কক্ষটি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয় বার্ষিক প্রার্থনা উৎসবের সময়, জুলাই মাসে। দাঁতটিকে তখন রাখা হয় স্তূপ আকৃতির সোনার পাত্রে। ক্যান্ডি শহরজুড়ে তখন বার্ষিক শোভাযাত্রার আড়ম্বর। গোটা শ্রীলংকা তো বটেই, সারা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই তখন তাদের এই মহাতীর্থের কাছে ছুটে আসতে চান। দ্বীপদেশ শ্রীলংকার সবচেয়ে বড় শোভাযাত্রাটা হয় তখন। এই শোভাযাত্রা ক্যান্ডি শহরকে শ্রীলংকার সাংস্কৃতিক রাজধানীর মর্যাদায় আসীন করার অন্যতম কারণ বৈকি।
বার বার সংস্কার হওয়ার পরও অপার সৌন্দর্য ধারণ করা দাঁতের মন্দিরকে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার মর্যাদা দিয়েছে ইউনেস্কো।
এই দাঁতের মন্দির বা টুথ অব টেম্পল মূলত ক্যান্ডিয়ান রাজ্যের রয়াল প্যালেস কমপ্লেক্সের অংশ। অনতি দূরেই ছিল রাজার বসবাস। মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন তিনি। মন্দিরের বাদ্য-বাজনার সুরে মিশে থাকতো নানা ভাব ও ভাষার আবহ। বাদ্যের বিশেষ সুর শুনেই রাজা বুঝতেন কখন মন্দিরে আসতে হবে তাকে।
বর্তমান মন্দিরের খানিক উত্তরে রাজার মূল প্রাসাদের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। কিছু অংশে জাদুঘর। আরও উত্তরে উদাবাত্তা কেলে স্যাঙ্কচুয়ারি। শহরের ভেতরে এমন অভয়ারণ্য বিরলই বটে।
মন্দিরের পূর্বদিকে ক্যান্ডি লেক। জল ছুঁয়ে অনবরত উড়ছে পাখির ঝাঁক। ভর সন্ধেতেও নীড়ে ফেরার নাম নেই। লেকের পাড়জুড়ে সমবেত দর্শনার্থীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে পাখিদের উড়াউড়ি। দলপতি আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল দলের অন্য সদস্যদের খোঁজ করছিলেন। একটু পরই এসে হাজির হলেন তারা। মূল দলের সঙ্গে মন্দিরে ঢোকেননি।
ট্যুরিজম কর্মকর্তা জুদে মুরসালিনকে নিয়ে ক্যান্ডির কাঁচাবাজার দেখতে গিয়েছিলেন সাজ্জাদ হোসেন ও আজিম খান রনি। তারা 'লাল কলা'র ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন। সাধারণ কলা দশ টাকা হলে এই কলা বিকোয় প্রতি পিস ৪০ টাকায়। পৌরুষ বর্ধক হিসেবে নাকি ভালো কাজ করে। শ্রীলংকায় আসার পর থেকেই এই নিয়ে হাসি-মশকরা চলছে। এমন শক্তিবর্ধক থাকতেও কেন গোটা শ্রীলংকার জনসংখ্যা এক ঢাকা শহরের জনসংখ্যাকেই ছাড়াতে পারছে না তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা নেহায়েত কম হয়নি। আর এক প্রস্ত হাসির রোল পড়লো সবার ভেতরে।
লেকের পাড় ঘুরে ছুটলো ট্যুরিস্ট বাস। ডিনার হলো পাহাড়ের ওপরেই ছোট একটা টিলার মাথায়। হোটেল আর্লস রিজেন্সির এক সুন্দর রেস্তোরাঁয়। লাইফ মিউজিকের আবহে নানা পদের খাবারের বুফে আয়োজন। এক কোনায় শ্রীলংকার স্পেশাল খাবার কত্তুরোটি তৈরি হচ্ছে। তপ্ত তাওয়ার ওপর রুটি ডিমভাজি, নানা পদের সবজি দিচ্ছেন শেফ। দুই হাতে দুই ছুরি নিয়ে সেগুলো অনবরত কেটে চলেছেন। সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে ক্ষুধা বাড়তে থাকে।
ডিনার শেষে ফের পথে গড়ায় ট্যুরিস্ট বাস। এবার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে মহাবেলি গঙ্গা পার হয়ে থামে বুলেটের মতো শেপ নেওয়া আর একটা বদ্বীপে, পাহাড়ের কোলে।
জুলাই থেকে বর্ষা শুরু হয় ক্যান্ডিতে। এখন ফেব্রুয়ারির শেষ প্রায়। সন্ধ্যার পর থেকে ক্যান্ডির আকাশ তবু মেঘলা। আর্লস রিজেন্সি হোটেলে পৌঁছানোর খানিক পরই ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। বাতাসের বেয়াড়াপনা নেই, বাওছিটানি নেই। চারতলার বারান্দায় বসে সুন্দর বৃষ্টি উপভোগ করা যায়। পাহাড়ের কোলে কয়েকটা ভবন নিয়ে পাঁচ তারকা হোটেল আর্লস রিজেন্সি। ভবনগুলো ছাদযুক্ত ওয়াকওয়েতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

■ মহাবেলি গঙ্গার তীরে লেখক

পুরো কম্পাউন্ডটাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মোড়া, প্রকৃতিবান্ধব। পাহাড় না কেটে ঢালের উচ্চতার সঙ্গে সমন্বয় করে ভবন বিন্যাস। তাই সব স্থাপনা একই সমতলে নয়। ওপরের ঢালে দোতলা হলে, নিচের ঢালে চারতলা ভবন। কী অভূতপূর্ব সমন্বয়!

সামনে রিসিপশন ভবনের ওপাশে আরও উঁচু পাহাড়ি ঢালে সারি সারি আলো। ঢালজুড়ে বসবাসের চিহ্ন। আলোমালার পেছনে রাতের আঁধার মেখে কালচে হয়ে আছে পাহাড়টা। মাঝরাত অবধি একটা জম্পেশ আড্ডার পর গভীর ঘুম।

কাক ডাকা ভোরে বিছানা ছাড়তেই সঙ্গী স্নিগ্ধ প্রকৃতি। রাতের বৃষ্টিধোয়া গাছের পাতাগুলো সকালের আলোয় হাসছে। ভেজা বুনোপথে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন কেউ কেউ। নিচের সুইমিংপুলে ইউরোপীয় ললনাদের জলকেলি। ইউক্রেনে সদ্য যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেও রাশিয়ান ট্যুরিস্টের ঢল থামেনি শ্রীলংকায়। বেড়াতে এসে ওরা আয়েশ করতে জানে। কিন্তু বাংলাদেশি ভ্রামণিকদের সে ফুরসত কোথায়। তড়িঘড়ি নাস্তার টেবিলে ছুটলো সবাই। একটু পর ফের মহাবেলি পার হয়ে ক্যান্ডি শহরে। পূর্ব দিকে গেলে এই রাস্তাতেই পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। কিন্তু এবারের যাত্রাটা তার বিপরীতে, মানে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আড়াআড়িভাবে শহরটা পার হয়ে পশ্চিম প্রান্তে পেরাডেনিয়া রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন। ক্যান্ডিকে বেড় দেওয়ার আগে দক্ষিণ থেকে এসে এখানে একটা ইউ আকৃতির শেপ নিয়েছে মহাবেলি। তারপর উত্তরে ছুটেছে ক্যান্ডি শহরকে ডানে রেখে। এখানকার এই ইউ আকৃতির বেড়েই পেরাডেনিয়া গার্ডেন। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে মহাবেলি বেষ্টন করে রেখেছে পেরাডেনিয়াকে। দক্ষিণের প্রবেশ পথ দিয়েই মূল বাগানে ঢুকতে হয়।

এই পেরাডেনিয়া তাবৎ এশিয়ার মধ্যেই অন্যতম সেরা বোটানিক্যাল গার্ডেন হিসেবে বিবেচিত। দর্শনীয় এই বাগানের গোড়াপত্তন প্রায় সাড়ে ছয়শ বছর আগে। ১৩৭১ খ্রিষ্টাব্দে। গার্ডেনের আর্কাইভে এর ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৩৭১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন রাজা তৃতীয় বিক্রমাবাহু। তার রাজসভা স্থাপন করেন মহাবেলি নদীর তীরে। রাজসভার কাছে শুরু হয় এক বাগানের শুভযাত্রা। তবে কোনো এক রানির জন্য এই বাগানের জন্ম বলেও মত মেলে।

১৭৪৭ থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আসীন হন রাজা কীর্তি শ্রী রাজসিংহে। তার সময়ে এটি রাজবাগানের মর্যাদা পায়।

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা রজধি রাজাসিংহে এখানে বসবাস করেন। তার আগে রাজা বিমলা ধর্মসুরিয়া এখানে যে বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন সেগুলো সংস্কার করেন রাজা রজধি। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে অনেক যুদ্ধ আর আগ্রাসনের শিকার হয় পেরাডেনিয়া গার্ডেন। মহাবেলি নদীর উত্তর তীরে গণরূপাতে রাজা দ্বিতীয় রাজসিংহের সঙ্গে পর্তুগিজদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়। আরও পরে ইংরেজরা ক্যান্ডি দখল করলে অনেক কিছুর সঙ্গে ধ্বংস করা হয় পেরাডেনিয়ার বিহার ও স্তূপ। নানা সময়ে এই বাগানের স্থানান্তরও ঘটেছে কয়েক দফা। অনেক অস্থির সময় পাড়ি দিয়ে পেরাডেনিয়া ফিরেছে তার ভিত্তিভূমিতে। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার মুন এই গার্ডেন পুনর্গঠন করেন। সেই বাগান এখন আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। এখানে এখন অনেক প্রজাতির বৃক্ষরাজি, পুষ্পমালার সমাবেশ।

বর্তমানে প্যারাডেনিয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের আয়তন ১৪৭ হেক্টর। আছে চার হাজার প্রজাতির গাছ। পাম প্রজাতির গাছই আছে দুশ'রও বেশি। আছে দর্শনীয় অর্কিড কালেকশন। ফুলের আধিক্য ছাড়াও আছে ওষুধি ও মসলা প্রজাতির নান্দনিক প্রদর্শনী। পাম গাছের ছায়াঘেরা পথ মন জুড়িয়ে দেয়।

মূল গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগোতেই বিপুল বিস্ময়ে থামতে হয় ডাবল কোকোনাট বৃক্ষের নিচে। একগুচ্ছ গাছে ঝুলে আছে সিসিলির অতিকায় ডাব। ডাবল কোকোনাট বলতে কেউ যদি শ্রীলংকার জনপ্রিয় কিং কোকোনাটের দুই গুণ বুঝে থাকেন, তাহলে মস্ত ভুল হয়ে যাবে। এই ফল সাধারণ ডাবের চেয়ে কয়েকগুণ বড়ো। একটা নারিকেল পরিপক্ক হতে সময় লাগে বছর পাঁচেক। দামও তাই আকাশছোঁয়া। পৃথিবীর বৃক্ষরাজির বৃহত্তম বীজ উৎপাদনের ক্ষমতা এই প্রজাতির নারকেল গাছই দেখিয়ে যাচ্ছে।

ডাবল কোকোনাটের সঙ্গ ছেড়ে বাঁয়ের পথ ধরে আরও এগোতে একটা লেক। শ্রীলংকার মানচিত্রের আদলে গড়া। ভালো করে দেখলে মনে হবে, গোটা শ্রীলংকা দ্বীপটাকেই শুইয়ে রাখা হয়েছে এখানে। কেবল জলবেষ্টিত স্থলের বদলে স্থলবেষ্টিত জলদ্বীপ। প্রান্তজুড়ে জলগুল্ম। অন্যতম আকর্ষণ নীল নদ অববাহিকার প্যাপিরাস। কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য যার খ্যাতি জন্ম থেকেই শুনে আসা। আর একটা অন্যতম দর্শনীয় উদ্ভিদ হলো পানিকলা। লেকজুড়েই নানা প্রজাতির ওয়াটার লিলি।

লেকের অদূরে নানা প্রজাতির বাঁশঝাড়। বার্মা থেকে আনা পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁশ। প্রায় ৪০ মিটার উঁচু। ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বেড়। কচি বাঁশগুলো দিনে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। যেন দ্রুত বড় হতে হতে আকাশ ছুঁতে চায়। এমন মহাবাঁশ ছাড়াও আছে হলুদ বাঁশ, পালকপাতা বাঁশ, কাঁটা বাঁশ। মোট সাত প্রজাতির বাঁশ আছে এখানে। আকাশছোঁয়া ডগাগুলো বাতাসে দুলে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে দর্শনার্থীদের।

সামনে অতি সুন্দর একটা পামবন পেরিয়ে ডানে উন্মুক্ত চত্বর। দুই একরজুড়ে সবুজ ঘাসের গালিচা। এর নাম গ্রেট লন। মাঝখানে জীবন্ত ছাতার মতো ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে জাভার ডুমুর গাছ। গ্রেট লনের ওপাশে বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। শ্রীলংকায় এসে স্মারক হিসেবে একটা গাছ রোপন করেছিলেন তিনি। সেই গাছ এখন আশেপাশের আর সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে।

গ্রেট লন ছাড়াতেই একটা মহিরুহ। বহুধাবিভক্ত শাখা-প্রশাখায় অদ্ভুত সুন্দর নকশা গড়ে রেখেছে। একটা ডাল নেমে এসে বসার আসন বানিয়ে রেখেছে যেন। সেখানে বসে-দাঁড়িয়ে নিজেকে ফ্রেমবন্দি করার জন্য ভিড় জমেছে দর্শনার্থীদের। কেউ ছবি তুলছেন, তো কেউ দাঁড়িয়ে আছেন সিরিয়াল পাওয়ার অপেক্ষায়।

সামনে আর একটা পাম এভিনিউ। শ্রীলংকার পামগাছগুলো বাংলাদেশের তুলনায় সরু, লম্বা। ২১ মিটার উঁচু হয় একেকটা। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। এই বাগানে পাম এভিনিউ আছে তিনটি। অনন্য ফ্লাওয়ারিং ট্রি সমাবেশের মধ্যে রয়েছে ২০ হেক্টরজুড়ে আট হাজার আরবোরিটাম। ফ্লাওয়ারিং ট্রি গার্ডেনের পাশেই শত প্রজাতির ফার্নের সমাবেশ। আছে রকমারি পুষ্পশোভিত ফুলবাগান। নানা প্রজাতির ক্যাকটাস। মসলা বাগানে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে রোপিত বৃক্ষ। বিশ্বজুড়ে খ্যাতি কুড়ানো মরিচ আর দারুচিনি বৃক্ষের প্রদর্শনী। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও ডিউক অব এডেনবুর্গ শ্রীলংকা সফরে এসেছিলেন ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছরের ২৪ অক্টোবর তারা একটা অশোক গাছ রোপন করেছিলেন এখানে। একই বছরের ৫ মার্চ জাপানের ক্রাউন প্রিন্স আকিহিতো ও ক্রাউন প্রিন্সেস মিকিহিতো রোপন করেছিলেন ইয়োলো ট্রামপেট ট্রি। দুটো গাছই পাশাপাশি। বয়সে কয়েক মাস বড় ট্রামপেট ট্রি শাখা বাড়িয়ে যেন আগলে রেখেছে অশোক গাছটাকে। শ্রীলংকায় যার পরিচিতি দুঃখহীন বৃক্ষ নামে। গাছটির ঘনপাতার ফাঁকে লালচে ফুলের উঁকি। অদূরে অর্কিড হাউসে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্কিড। বেরোনোর মুখে বিক্রয় কেন্দ্রে হস্তশিল্পের রকমারি পসরা। এরই মধ্যে দিনের দ্বিতীয় প্রহর পার হতে চলেছে। ফের যাত্রা শুরু হতে না হতেই আর একবার থামতে হলো মহাবেলির পাড়ে। গাছপালার ফাঁকে কুলকুলিয়ে বইছে মহাবেলি। এবারের যাত্রা এই মহাবেলিরই উৎস্য মুখের পাশে। শ্রীলংকার শীতল শহর নুয়ারা এলিয়ায়।

লেখক: প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক আমাদের বার্তা ও নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন। ◆

COLORFUL HILL TRACTS

Bandarban | Rangamati | Khagrachari

Adventure UNLIMITED

Explore:

Khagrachari-Sajek (3D-2N)
Rangamati-Kaptai Lake (3D-2N)
Bandarban-Nilgiri (3D-2N)

Experience

Authentic Tribal Culture, Food, Crafts & Festival

Please contact for more details

River & Green Tours

RIVER AND GREEN TOURS
House-97/1, Flat-2B, Shukrabad, Dhanmondi, Dhaka-1207
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com

+88 **01819224593**
+88 **01730450099**

পর্দা নামল ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের

■ **পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন**

বর্ণিল আয়োজন হয়ে গেল বাংলাদেশের সর্বোবৃহৎ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার (এটিএফ)। রাজধানী ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেশন সিটি, বসুন্ধরায় এই মেলার আয়োজন করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে মেলা চলে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। তিনদিন ব্যাপী এই মেলায় দশনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় ছিল।

এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, ঢাকায় নেপাল দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, রয়েল থাই দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, মালয়েশিয়া দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতসহ অন্যান্য দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ ও দেশ-বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ।

পর্যটন বিচিত্রার আয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সার্বিক সহযোগিতায় এ মেলা হয়।

এবারের মেলায় ৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভারত, ভুটান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, তুরস্ক ও লিথুনিয়াসহ প্রায় ১৩০টি দেশের বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা মেলায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫০টির বেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছিল। মেলায় পর্যটন মৌসুমে দেশ-বিদেশে বেড়ানোর বিভিন্ন আকর্ষণীয় ভ্রমণ অফারসহ হোটেল, রিসোর্ট বা প্যাকেজ বুকিংয়ে বিশেষ ছাড় দেয়া হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিল হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, ক্রুজলাইন্স, এয়ারলাইন্স, ট্যুর অপারেটর ও থিমপার্কসহ বিনোদনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

এছাড়া মেলায় বৈচিত্র্যময় আয়োজনের মধ্যে ছিল পর্যটনবিষয়ক সেমিনার, শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও বিজনেস টু বিজনেস মিটিং। ছিল শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ মেলার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরা হয়।

মেলায় এয়ারলাইন্স পার্টনার ছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, হসপিটালিটি পার্টনার ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, অ্যাডভেঞ্চার ডাইনিং পার্টনার- ফ্লাই ডাইনিং, ক্রুজ পার্টনার ঢাকা ডিনার ক্রুজ, এন্টারটেইনমেন্ট পার্টনার ফ্যান্টাসি কিংডম ও ট্রান্সপোর্ট পার্টনার কনভয় সার্ভিস ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট পার্টনার- বোটাফ।

এবারের মেলায় প্রাইম পার্টনার কান্ট্রি ছিল নেপাল, পার্টনার কান্ট্রি থাইল্যান্ড, ফিচার কান্ট্রি- ভারত, ভুটান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, তুরস্ক ও লিথুনিয়া এবং মেলার হোস্ট কান্ট্রি ছিল বাংলাদেশ।

এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের তিন দিনব্যাপী নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিজনেস মিটিং (বিটুবি), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নেপাল ট্যুরিজম নাইট, ভারতীয় ভিজিট ডুয়ার্টসের (Visit Doorts) ক্যাম্পেইন উদ্বোধন, গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নে 'গুরুবাস' উদ্যোগবিষয়ক সেমিনার, আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়নে বিবিআইএন ট্যুরিজম ফোরামের সভা, বোটাফের উদ্যোগে নেটওয়ার্কিং নাইট, শিশুদের জন্য 'নদীমাতৃক বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম নাইট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলার অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স প্রদান এবং পর্যটন বিচিত্রার অক্টোবর সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ।

পর্যটন উন্নয়ন সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক ও অন্যতম পর্যটন মেলা। এ মেলার মাধ্যমে পর্যটন সংস্থাগুলো প্রচার-প্রচারণার এক বিশেষ সুযোগ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন এবং পর্যটন মৌসমে পর্যটকেদের বেড়ানোর খোঁজখবর দিতে এই মেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের পর্যটন শিল্প কোভিড পরবর্তী সময়ে আরও জোরালোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে এবং টেকসই উন্নয়নে এই মেলাটি ভূমিকা পালন করে আসছে।

পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, আসন্ন পর্যটন মৌসুমকে সামনে রেখে এ মেলা পর্যটকদের জন্য নানা রকমের বৈচিত্র্যময় অফার তুলে ধরেছে। পর্যটকরা সাশ্রয়ী মূল্যে তাদের ভ্রমণের আগাম বুকিং দিয়েছে। আশা করছি- ভবিষ্যতেও দেশ ও আঞ্চলিক পর্যটন শিল্পের জন্য এ মেলাটি একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে এবং সব গন্তব্যে পর্যটকদের আনন্দ মিছিল ছড়িয়ে পড়বে। কোভিড পরবর্তী এ মেলা আয়োজনের ফলে নতুনভাবে পর্যটনের দুয়ার খুলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। ◆

১০ম এশিয়া ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২৩

মেলার সমাপানী দিনে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় ১০ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। আগামী বছরের ২১-২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য মেলার আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন

প্রেস কনফারেন্স

৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২২ (ফ্ল্যাশব্যাক)

৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার উপলক্ষে ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন (বাঁ থেকে) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এমপি, একই মন্ত্রণালয়ের সচিব মোকাম্মেল হোসেন ও পর্যটন বিচিত্রার সম্পাদক এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারের চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দিন হেলালসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ

নবম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত, রয়েল থাই দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, মালয়েশিয়া দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতসহ অন্যান্য দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশ-বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দ

৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২২

৯ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার-২০২২

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান

শ্রীলঙ্কান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রডাক্ট লঞ্চিং : ভিজিট ডুয়ার্টস ও গুরুবাস

রিফিংকিং ট্যুরিজম

বোটাফ নেটওয়ার্কিং নাইট

আলোচনায় বিবিআইএন ফোরাম

বিজনেস টু বিজনেস মিটিং

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

এটিএফ-২০২২
অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স

9th ASIAN TO

ATF DHAKA 2023

THE BIGGEST EVER TOURISM EXPO IN BANGLADESH

10th ASIAN TOURISM FAIR

20 COUNTRIES 300 EXHIBITORS

You are invited to join

asian Tourism FAIR

Connecting Regional Tourism

September 21 22 23, 2023

International Convention City Bashundhara (ICCB)

Dhaka, Bangladesh

Partners of ATF 2022

Endorsed by

Supported by

Organized by

Prime Partner Country

Partner Country

Host Country

Feature Country

Airlines Partner

Hospitality Partner

Adventure Dining Partner

Cruise Partner

Entertainment Partner

Transport Partner

ISP Partner

Networking Event Partner

www.asiantourismfair.com

LETS DAY OUT

রিভার ক্রুজ
RIVER CRUISE

পিকনিক
PICNIC

Your Events

- Corpotate Outing
- Annual Picnic & Cruise
- School Day out
- Social get-together
- Corpotate Team Building

Our Services

- Transportation
- Spot Reservation
- Vessel Reservation
- Branding & Cultural Program
- Meals, Fun & Entertainment

River & Green Tours

RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207. Bangladesh
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com
+88 01819224593, 01979224593